অন্নভোগ
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

এই লেখকের অন্যান্য বই

নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে
অলৌকিক জলযান
ঈশ্বরের বাগান
মানুষের ঘরবাড়ি
আবাদ
নগ্ন ঈশ্বর
ফেনতুর সাদা ঘোড়া
একটি জলের রেখা
মৃণ্ময়ী

সকালে ঘুম থেকে উঠেই পিলুর বুক ধড়াস করে উঠল।

দাদা বিছানায় নেই।

বাড়িতে সবার আগে ওঠেন বাবা। ব্রাহ্ম মুহূর্তে তিনি ঘুম থেকে ওঠেন। অবশ্য পিলুর মনে হয় বাবার বোধ হয় শেষ রাতের দিকে বিছানায় পড়ে থাকতে কষ্ট হয়। রাত থাকতেই বাবা শুয়ে শুয়ে স্তোত্র পাঠ করেন। বেশ জোরে। ভোর-রাতের ঘুম কার না প্রিয়! সে যে এত ঘুমাতে পারে, তারও ঘুম কোনো কোনো দিন বাবার স্তোত্র পাঠে ভেঙ্গে যায়। আর আশ্চর্য বাবার সেই স্তোত্র পাঠ শুনতে শুনতে সে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। গীতার সব শ্লোক বাবার মুখস্থ। সে দু-একটা শ্লোকের অর্থও জেনে নিয়েছে। ঠিক জেনে নেওয়া নয়, যেন নানা কাজে কর্মে দাদাকে উপলক্ষ্য করে বলা—বুঝলে কেহ আত্মাকে আশ্চর্যবৎ মনে করে—কেহ বা আশ্চর্যবৎ বলিয়া আত্মাকে বর্ণনা করে, আবার কেহ আশ্চর্য বলিয়া শোনে। কিন্তু ইহার বিষয় শুনেও কেহ ইহাকে বোঝে না।

দাদাটা তার দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে। বাবাও। কাল যা গেল!

দাদার সেই আর্তনাদ সহসা বুকে বেজে উঠল, মা, আর কেউ বিশ্বাস না করুক, তুমি বিশ্বাস কর পরীকে আমি মারিনি। মারতে পারি না।

সে দেখল দরজা খোলা। ক্যাচা বাঁশের বেড়ায় খোপ কাটা জানালা। বাবা পূজার ফুল তুলছেন। কাল বাবা দাদার অবিমৃষ্যকারিতায় ক্ষোভে রাতে অন্ন গ্রহণ করেননি। বাবা তাদের এরকমেরই। পুত্র-কন্যা কিংবা যে কেউ কোনো অশান্তির কারণ ঘটালে, বাবা সব সময় সংস্কৃত ঘেঁসা শব্দ ব্যবহার করেন। তার কাছে শুধু না, বাবার কাছে,পরীদির দাদামশাইয়ের কাছে দাদার উন্মাদের মতো আচরণ অবিমৃষ্যকারিতায় সামিল মনে হয়েছিল।

সেই দাদা বিছানায় নেই।

রাতে মা এত সাধাসাধি করল, দাদা কিছুতেই খেল না। দু'জন দু-ঘরে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। কাউকে টলানো যায়নি।

বাবার আক্ষেপ, শেষে এই ছিল কপালে! নারী হল গে শক্তিরূপিণী দেবী। সে-ই মানুষের শক্তির উৎস। যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা। তার গায়ে হাত! মাকে ডেকে বলেছিলেন, এ-যে ধনবৌ মহাপাপ। এ-পাপের কোনো ক্ষমা নেই। প্রায়শ্চিত্তের বিধান কী আছে জানি না, স্থির করেছি, দু-দিন উপবাস। স্থির করেছি দু-দিন অহোরাত্র চণ্ডীপাঠ।

বাবা এতে হয়তো বুঝেছিলেন দেবী প্রসন্না হবেন।

বাবা গৃহ দেবতার ফুল তুলছেন। তাকে কিছুটা ক্লিষ্ট দেখাচ্ছে। পায়ে খড়ম। খটাখট শব্দ হচ্ছে—সে এ-সব দেখতে দেখতে সহসা ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে এল। ঘুম থেকে মা উঠেছে—কারণ সে দেখছে, পূজার বাসন নিয়ে পুকুর ঘাটে যাচ্ছে মা। নবমী বুড়িও ওঠেনি। তার দরজা বন্ধ।

সকাল হয়নি ভাল করে।

পিলু দৌড়ে গিয়ে মাকে বলল, দাদা কোথায়!

মা বলল, কেন, দাদা কোথায় আমি কী করে জানব। তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস কর! ঘরে নেই!

—না না ঘরে নেই।

মা কী ভাবল কে জানে, বাসন নামিয়ে নিজেই ছুটে এল। পিলু ততক্ষণে বাবার কাছে হাজির।

—বাবা, দাদা বিছানায় নেই।

—উঠে কোথাও গেছে।

তা যেতেই পারে। চারপাশে এখনও কিছু জঙ্গল আছে—কিংবা দাদা যদি বাদশাহী সড়কে উঠে যায় ঘুরে বেড়াবার জন্য। কারণ কাল রাতে সে বুঝেছে, দাদা ঘুমাতে পারছিল না। কেবল ছটফট করছে। বৃষ্টি হয়নি কিছুদিন। শরৎকাল এসে গেছে—মাঠে মাঠে ধানের চাষ। রোয়া ধান বড় হয়ে গেছে—এবং চারপাশে শরতের এক ছবি—যেমন শেফালি গাছটার নিচে সাদা ফুল, স্থলপদ্ম গাছে ফুলের কুঁড়ি, ফুটবে ফুটবে করছে—রাস্তার

পাশে আমগাছগুলি ঘন সবুজ। ফড়িং উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। এক ঝাঁক প্রজাপতিও বাড়ির এ-ধার ও-ধার জঙ্গলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

পিলু ছুটে আবার তার ঘরে চলে এল। সে কী করবে ঠিক করতে পারছে না!

একবার খালপাড়ে ছুটে যাচ্ছে, একবার পুলিশ ক্যাম্পের দিকে। আর ডাকছে, দাদারে!

সকাল বেলায় এ-যে কী আতঙ্ক পিলু ভালই জানে। তার ক্ষোভ হচ্ছে বাবার উপর।

কী দরকার ছিল পরীদির দাদুর কাছে যাওয়ার!

ডাকলেই যেতে হবে! বড়লোকদের সে দু চোখে দেখতে পারত না। তার বাবা গরীব। বাবা গরীব হলে বাড়ির আর সবাই গরীব থাকে। বাবাকে গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে গেছে। বোঝো এবার সমাদরের ঠ্যালা!

—সাধন কাকা, দাদাকে দেখেছো। পিলু খুঁজছে।

সাধন সরকার মিল থেকে ফিরছিল রাতের ডিউটি সেরে। যদি দাদা লাল সড়কের দিকে হাঁটতে হাঁটতে চলে যায়। রাস্তায় দেখা হয়ে যেতে পারে।

ইস তার দাদা এত চাপা স্বভাবের! কাউকে কিছু না বলে আবার কী হাওয়া! সেই বছর তিন আগেও ঠিক একবার দাদা হাওয়া হয়ে গেছিল। বাড়িতে কেন যে দাদাটার মন বসছে না!

কিন্তু কাল যা গেল—! বাবার যে কী দরকার ছিল বলার, এ-যে মহাপাপ ধনবৌ। এ-পাপের কী প্রায়শ্চিত্তের বিধান আমার জানা নেই।

আর বলি পরীদির দাদুই বা কী—বাড়ির কলঙ্ক রটাতে আছে! পরীদি তো হজম করে গেছে।

দাদা বাড়ি ফিরছে না, সকালে শহরে বের হয়ে গেছে, দাদার কত কাজ! সার্টিফিকেটের নকল নিয়ে—পরীদির দাদুর সঙ্গে দেখা করতে গেছে। অপরূপা কাগজ নিয়ে দাদা মেতে আছে—কিন্তু দুপুরে ফিরল না বিকালে ফিরল না। গেল কোথায়! সে জানে হয় মুকুলদার কাছে নয় পরীদির কাছে গেলে ঠিক খবর পেয়ে যাবে। আর যেতেই সে কী ধুন্দুমার কাণ্ড! ধর ধর। তাকে ধরার জন্য ঠাকুর চাকর দারোয়ান সবাই ছুটে

এসেছিল। ভাগ্যিস পরীদি নেমে এসেছিল সিঁড়ি ধরে। এক গালে আঁচল চাপা। এসেই বলেছিল, ওকে ছাড় বলছি। তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, তুই!

সে বলেছিল, জান দাদা বাড়ি ফেরেনি?

পরীদির মুখ কালো হয়ে গেছিল।

তারপরই পিলু বলেছিল, তোমাকে সত্যি মেরেছে দাদা! কারণ পিলুর দিকে ছুটে আসার সময় চাকর দারোয়ানরা যা বলেছে তাতে পিলু বুঝে গেছে দাদা পরীদির গায়ে হাত তুলেছে।

সে যেতেই সঙ্গে সঙ্গে পরীদি দাদার বন্ধুদের কাছে ফোন করেছিল—না নেই।

দাদা সেদিন ফিরে এসেছিল রাত করে। কোথায় ছিল সারাটা দিন কেউ বলতে পারে না। দাদাও গুম মেরে ছিল।

সে ভেবেই পায় না পরীদিই বা বলতে গেল কেন, বাড়িতে গিয়ে কিন্তু আবার বলিস না। আমি খোঁজ খবর নিচ্ছি। যেন পরীদির সঙ্গে দাদার কিছুই হয়নি—বরং পরীদিই ভয়ঙ্কর ত্রাসের মধ্যে পড়ে গেছিল দাদার জন্য। সাঁজ বেলায় খোঁজ নিয়ে গেছে, পরদিন সকালে সে নিজে গিয়ে বলে এসেছিল, দাদা ফিরেছে। পরীদির মুখ সকালের মতো প্রসন্ন হয়ে গেছিল সেই খবরে। যে মারল, আর যাকে মারল তাদের মাথা ব্যথা নেই—যত মাথা ব্যথা বাবার আর পরীদির দাদামশাইয়ের। গাড়ি করে নিয়ে গিয়ে কী দরকার ছিল বলার—শেষ জীবনে এত বড় অপমান বাড়ি বয়ে করে যাবে ভাবতে পারিনি বাঁড়ুজ্যে মশাই। আমার এত আদরের নাতিন—তার গায়ে হাত!

যেন দাদা পরীদিকে মারেনি, মেরেছে তার দাদুকে। তাদের পরিবারের মর্যাদায় হাত দিয়েছে। নিশ্চয় পুলিশ থানা হতে পারত—কিন্তু বনেদি পরিবারের কলঙ্ক প্রকাশ হয়ে পড়বে। আরে বাবা, তাই বলে বাবাকে ডেকে না বললে হত না! বাবা তো এখন নিজেই ঢাক ঝুলিয়ে সবার কাছে বাজাবেন। বলবেন, না এত আশা ছিল বড় পুত্রের উপর—সেই আমার এখন কু-পুত্র। দেবীর গায়ে হাত! নারী হল গে দেবী। যজমানদের ঘরে ঘরে একসময় বাবা তার বড় পুত্রের গর্ব করে বেড়াতেন। তখন বনজঙ্গল

কেটে সবে বাড়ি ঘর শুরু হয়েছে, সব উদ্বাস্তু পরিবার বানের জলের মতো আসতে শুরু করেছে—বাবা দেশের সব মানুষজনকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছেন—শহর থেকে ক্রোশ দুই দূর—রাজাদের দেবোত্তর সম্পত্তি। জলের দামে বিক্রি হচ্ছে। বনজঙ্গল পার হয়ে গেলেই লাল সড়ক। সড়ক ধরে গেলে, কাশীমবাজার শহর—পোস্ট অফিস আছে, লোকজন এসে গেলে বাজারও হয়ে যাবে—ক'পা হেঁটে গেলে কাপড়ের মিল, সড়কের পাশে পুলিশ ট্রেনিং ক্যাম্প—ওখানে তিন তিনটে টিউকল। ক্রোশখানেকের মধ্যে দু'দুটো রেল স্টেশন। এত সুবিধা জায়গাটার জানিয়ে বাবা কেবল চিঠি লিখছিলেন। আর দু-তিন বছরের মধ্যেই দেখা গেল বনজঙ্গল সাফ। ছোট ছোট সব কুঁড়ে ঘর—যে যার লপ্তের জমিতে চাষআবাদ পর্যন্ত শুরু করে দিয়েছে।

বাবার যজমানের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকল। ঘরে ঘরে বাবা একসময় খবর দিতেন, বড়পুত্র এবারে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবে—এত বড় খবর বাবার যে, যেখানেই যেতেন কথায় কথায় বলা চাই। দাদা এক বিষয়ে ফেল করার পর বাবার পুত্র গৌরব আরও বেড়ে গেল। যেখানে যান, এক কথা—বড় পুত্র এবারে এক বিষয়ে কম্পার্টমেন্টাল পেল। তা সোজা কথা! দশটা বিষয়ের মধ্যে ন'টাতেই পাশ—সোজা কথা! কে কবে জীবনে সব বিষয়ে পাশ করেছে। বড় পুত্রই ছিল তাঁর একমাত্র গৌরব করার মতো পুত্র।

তার পড়াশোনায় মন নেই—তাতে বাবার খুব দুঃখও নেই। যজমানরা তো থাকলই। তার উপর নবমী বুড়ি বাড়িতে উঠে আসার সঙ্গে কিছু গুপ্তধনও হাজির। এখন বাড়িটার আর হা-অন্ন অবস্থা নয়। কিন্তু বড় পুত্র শেষ পর্যন্ত এমন সুন্দর মেয়েটাকে মারল! এটা বাবা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেননি। পুত্র নিখোঁজ হলেও যেন বাবার কিছু যায় আসে না। গেছে কোথাও ফিরে আসবে। অসময় তো মানুষের জন্যই অপেক্ষা করে থাকে। আবার সুসময়ও।

পিলু বাড়ি ফিরলে দেখল মায়া মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। এত সকালে, কে আর বলতে চায়, বিল্বকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মা বলল, কীরে পেলি?

—না।

—কোথায় গেল ! বাবা ঠাকুর ঘরে ফুলের সাজি রেখে বের হয়ে কিছু বলতেই ক্ষিপ্ত হয়ে গেল মা। এ-বাড়িতে কেউ থাকবে না বলে দিলাম। কালকে তোমার নাটক করার কী দরকার ছিল ! কই পরী তো এসেছিল, বিলুর খোঁজ নিতেই এসেছিল। মারলে, কেউ কাউকে খুঁজতে আসে ! বল, চুপ করে থাকলে কেন। রায়বাহাদুর ডেকে বললেন, আর তুমি বিশ্বাস করে ফেললে। অহোরাত্র চণ্ডীপাঠ ! চণ্ডীপাঠই সার তোমার বলে দিলাম !

বাবা যেন কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে গেছেন। কী ভেবে বললেন, দেখতো সাইকেলটা আছে কি না !

পিলুর মনেই হয়নি, দাদা কোথাও বের হলে সাইকেল ছাড়া বের হয় না। দাদা আছে সাইকেল নেই তা যেমন তার বন্ধুরাও ভাবতে পারে না, বাড়িতেও এটা কেউ অনুমান করতে পারে না।

পিলু দেখল সাইকেলটা ঠিকই আছে। ওর কেমন বুক ফেটে কান্না বের হয়ে আসছে। যেন এক্ষুনি বের হয়ে যাওয়া দরকার—লাইনের ধারে দেখে আসা—পরীদিকে দাদা এমনি এমনি মারতে পারে না। সে এও দেখেছে, পরীদির বাড়ি আসাও দাদা পছন্দ করত না। এক কলেজে পড়ে সেই সুবাদে দাদার সঙ্গে আলাপ, তারপর দাদার মধ্যে পরীদির মতো মেয়ে কী আবিষ্কার করেছে কে জানে—পরীদির উৎসাহে, মুকুলদার চেষ্টায় একটা কাগজও বের করে ফেলেছে। পরীদি পারে না হেন কাজ নেই। পার্টি করলে সব পারে। যখনই সে পরীদিকে লাল রঙের সাইকেলে চলে যেতে দেখেছে, শহরে কিংবা পঞ্চাননতলায় সে না ডেকে পারেনি— পরীদি, পরীদি !

আর পরীদিও যত দূরেই থাক ঠিক চিনতে পারে, কে ডাকে ! বিলুর ছোট ভাইটা। শ্যামলা রঙ, বিলুর মতো গায়ের রঙ পায়নি, তবু ভারি মিষ্টি মুখের ছেলেটি ডাকলে পরী থেমে পড়ত। বাড়ির কুশল নিত। চুপি চুপি বলত, আমি যে তোদের বাড়ি যাই, তোর দাদাকে কিন্তু বলিস না। কেমন লক্ষ্মী ছেলে ! মাসিমাকেও বলবি না।

পিলু সাইকেলে চেপে বসতেই বাবা বললেন, কোথায় যাচ্ছ !

রায়বাহাদুরের বাড়িতে খবর দিতে যেও না। দেখ না অপেক্ষা করে। অমন খারাপ কথা কিছু আমি বলিনি ! আর আমি অমন কোনও পাপ করিনি, আমার ছেলে কিছু করে বসবে। আর একটু দেখে যাও। মন মানে !

আজকাল শুধু দাদা না, সেও বাবার কথা অগ্রাহ্য করতে শিখেছে। সে সাইকেল চালিয়ে যত দ্রুত সম্ভব পঞ্চাননতলায় উঠে গেল। রেল বরাবর সে যাচ্ছে। কিন্তু সব স্বাভাবিক ! দোকান পাট খুলতে শুরু করেছে ! ভাবল এক ফাঁকে বোর্স্টাল জেলের পাশ দিয়ে শহরে ঢুকে যাবে কি না। পরীদিকে খবর দেবে কি না—কিন্তু বাড়ি ফিরে যদি দেখে দাদা হাজির, দাদা নিজেই হম্বিতম্বি হয়তো করছে—এ কীরে বাবা, এক দণ্ড বাড়ি ছিলাম না, আর পিলু দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে দিয়েছে !

তার ভয় দাদাকে এ-জায়গাটিতেই।

সে নাকি তার দাদাকে নিয়ে বড় বেশি বাড়াবাড়ি করে।

দাদাই বলেছিল একদিন, শোন পিলু।

পিলু কাছে গেলে বলেছিল, তুই তোর দাদাটাকে কী ভাবিস বলত !

—কী ভাবি—বারে, তুই আমাকে দাদা বাজে কথা বলবি না বলে দিলাম। খুব খারাপ হবে ! আমি কী করেছি !

—করিসনি। আমি বিলাসপুরে রেলে চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছি, কে বলেছে সবাইকে বলে বেড়াতে ! যেখানে যাই এক কথা, কী ঠাকুর, তুমি রেলে চাকরি পেয়েছো ! যাক, ঠাকুরমশাইয়ের এবার কষ্ট দূর হবে। কী বিলু, আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ শুনলাম। রেলে চাকরি হয়েছে ! ইস কত বড় কথা। আমাদের কলোনির ছেলে রেলে চাকরি পেয়েছে সোজা কথা !

বিলুর তখন এক প্রশ্ন, কে বলল ?

—পিলু।

কে বলল ! —তোমার পিতাঠাকুর।

পিতাঠাকুরটিকে তো আর ধমক দেওয়া যায় না। বিলাসপুরে চলে যাচ্ছে, প্রথমে এপ্রেন্টিস, পরে জুনিয়ার অফিসার রেলের—কলোনির একজন গরীব বামুনের কাছে এর চেয়ে আর কী বড় খবর থাকতে পারে।

পিলু রেগে বলেছিল, শুধু আমাকে দুষছিস—বাবা যে মনসা পূজায় বেরিয়ে বাড়ি বাড়ি বলে এল—আসনে বসে ঘণ্টা নাড়ার সঙ্গেই কথা শুরু, বুঝলে কালীপদ, বিলু তো রেলে চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছে ! আসলে পিলু বুঝত এই বলে দাদা শুধু তাকে না বাবাকেও আভাসে জানিয়ে দিত—সে তার চাকরি নিয়ে, তার কৃতিত্ব নিয়ে এমন কী তার কবিতা লেখা নিয়েও কোনও বাড়াবাড়ি পছন্দ করে না ।

দাদা বলেছিল, খুব মজা না, রেলে চাকরি নিয়ে চলে যাব, আর তুমি বাড়ির সব মজা একলা ভোগ করবে ! পিলু ভেবে পায় না দাদা রেলের চাকরির নাম শুনলেই ক্ষেপে যেত কেন ।

এটা কী দাদার বনবাস ।

পরীদি দাদাকে পছন্দ করে । কত বড় বনেদি বাড়ির মেয়ে পার্টি করতে পারে, নাটকও করতে পারে তাই বলে একজন রিফুজি ছেলেকে নিয়ে বাড়াবাড়ি পছন্দ নাই করতে পারে । আবার কী যে মনে হয় ! দাদার দোষ কী, দাদা তো দেখেছে বাড়িতে পরীদি এলে একদিন সোজা বের হয়ে গেল, একদিন সে শুনেছে, মুকুলদা দাদাকে বলছে, না এটা তোমার বাড়াবাড়ি । আমরা এক কলেজে পড়ি—সে তো তোমার বাড়িতে আসতেই পারে । আমি এলে তো তোমার আনন্দ ধরে না ! পরী এলে নাকি তুমি রেগে যাও । সেদিন কিছুতেই এল না । জিপে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল । বলল, তোমরা যাও । বাবু বাড়ি থাকলে মাথা খারাপ করে ফেলতে পারে ।

পিলু ঠিক বোঝে না—পরীদি বাড়িতে এলে দাদা রেগে যায় কেন, পরীদির বাড়ি জগদ্ধাত্রী পূজা—সবার যাওয়ার কথা—পরীদি বার বার বলে গেছে—কিন্তু দাদা এমন অশান্তি শুরু করল যে কারও যাওয়াই হল না ।

চাকরি নিয়েও দাদা বলেছে, বাবা, রায়বাহাদুর নিশ্চয় পারেন । জমিদারি গেছে ঠিক, তবু যা আছে, কংগ্রেসের জেলা সভাপতি—মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান, ছেলেরা কৃতী । রেলে বড় ছেলে তাঁর বড় কাজ করে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হয় দেখুন ! আসলে কী দাদা বাবাকে বলতে চেয়েছিল, পরীদির দাদুর এটা চাল—দাদাকে দূরে

পাঠিয়ে দিলে পরীদি একা হয়ে যাবে—কিংবা দাদা একা হয়ে যাবে । এটা কী দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্য পরীদির দাদু বাবার উপর চাল চেলেছে । পিলু একদিন পরীদিকে বলতেই অবাক—কী বললি ! বিলু বিলাসপুরে রেলে চাকরি নিচ্ছে ! কৈ আমাকে তো ও কিছু বলেনি !

পিলু পড়েছিল মহাফাঁপরে । পরীদির বাবার দৌলতে দাদার চাকরি । আর পরীদিই জানে না ! সে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছিল ।

পরীদির এক কথা, গিয়ে দেখুক না তোর দাদা । কী ভেবেছে ! পড়াশোনা বন্ধ করে বাবু চললেন চাকরি করতে ।

পিলু ঠিক বোঝে না, পরীদির দাদুর এই লুকোচুরি খেলা কেন ! বাবাকেও বলেছে, দেখবেন যেন দু-কান না হয় । দু-কান হবে না, তা হলেই হয়েছে । আসলে পরীদির দাদু খবরটা গোপন রাখতে চাইছে নাতনির কাছ থেকে ।

দাদাও বোধ হয় গোপনে যাওয়া আসা করছিল—পরীদি আবার টের না পায় ! কী যে হয়েছিল ঠিক জানে না । সে যেন কীভাবে একদিন শুনেছিল—মা বাবাকে বলছিলেন, বুঝলে এ-সব সাময়িক দুর্বলতা ।

সে যে কিছু বোঝে না তা নয় ! আসলে এতবড় ঘরের মেয়ে পরীদি—ভীমরতি না হলে হয় ?

এমন কী দাদার প্রাইমারি স্কুলের চাকরি নিয়েও কম অশান্তি হয়নি পরীদির সঙ্গে দাদার !

রাস্তার ধারে, আমগাছতলায় পরীদি ফুঁসছে ।

—কী বললে, প্রাইমারি স্কুলে ? তোমার কী মান অপমান বোধ নেই । পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছ ! মানুষ গরীব বলে কী উচ্চাশা থাকতে নেই !

দাদারও জেদ—না আর পড়ছি না । পড়াটা বিলাসিতা । হাতের কাছে এত বড় সুযোগ ছাড়তে রাজি না । আমার এর চেয়ে বেশি কিছু হবে না পরী । কেন মিছিমিছি জেদ করছ ।

—আর তো দুটো বছর !

দাদা বলেছিল, তারপর কী হবে ।

—কিছু একটা হবেই ।

দাদাও কম যায় না । বলেছিল, হবে কচু । আমাদের এখন দু-বেলা

খেয়ে পরে বেঁচে থাকা দরকার। তোমার স্বপ্ন থাকতে পারে—আমার কোনও স্বপ্ন নেই।

খটাখটি শেষে এমন যে সে দেখেছে, পরীদি বাড়ি এলেই দাদা সাইকেলে বের হয়ে যেত। কোথায় যেত কে জানে! হয়তো মুকুলদার কাছে। 'অপরূপা' কাগজ নিয়ে দাদা মেতে আছে তখন। পরীদির কী আক্ষেপ, মাসিমা, বিলু সত্যি আর পড়বে না! পড়া ছেড়ে দেবে।

মা-রও কম আক্ষেপ নয়, কে বোঝায় বল। যেমন তোমার মেসোমশাই তেমনি তার পুত্র। আমরা সংসারে কে বল!

পরীদি বাবাকেও অভিযোগ করেছিল, মেসোমশাই, বিলু নাকি আর পড়বে না! প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি নিচ্ছে!

—আগে পাক। কথা হচ্ছে। মুকুলের জামাইবাবুকে চেন! তিনিই চেষ্টা করছেন। হয়ে যাবে মনে হয়। ঠাকুরকে তো তুলসি দিচ্ছি রোজ। দরখাস্ত করেছে। রিফুজিদের জন্য কী নাকি স্পেশাল ক্যাডার হচ্ছে! তাতেই ঢুকিয়ে দেবে। ঠাকুরের কী ইচ্ছে তা জানব কী করে!

—তাই বলে পড়া ছেড়ে দেবে! পরীদি কেমন হতবাক হয়ে গেছিল বাবার কথায়।

বাবা বলেছিলেন,মানু তো বলল, বিলুর মেধা কম। বি-এ, এম-এ পড়ে কিছু হবে না! চাকরি পেলে যেন না ছাড়ে। দিনকাল বড় খারাপ।

মানুকাকা শহরে থাকে—বাবা যে আত্মীয়টির আশ্রয়ে এসে এ-দেশে উঠেছিলেন। মানুর পরামর্শ রামায়ণ মহাভারতের চেয়েও বাবার কাছে বেশি সত্য। মানু যখন বলেছে তখন দাদা চাকরি নিয়ে যে ঠিক কাজই করছে, আর সংসারের যা পরিস্থিতি, তাতে চাকরি খুবই দরকার। তা-ছাড়া বাড়ির বড় পুত্রের দায়। —আমি আর ক'দিন, বিলুকেই তো এখন হাল ধরতে হবে—এমন সব কথা শোনার পর পরীদি কেমন মনমরা হয়ে গেছিল।

তবে পরীদিকে দাদা কেন যে মারল—এই রহস্যটা সে বুঝতে পারছে না।

সাইকেলে লাইনের ধারে চক্কর মেরে বাড়ি ফিরে এল—না অন্তত আর যাই করুক দাদা ক্ষোভে অভিমানে জীবন নাশ করেনি। বাড়িতে ফিরতেই

সে দেখল, বাবা পঞ্জিকা খুঁজছেন।

তা-হলে কী দাদা ফিরে এসেছে। সব কেমন স্বাভাবিক। না হলে বাবা পঞ্জিকা খুঁজতে যাবেন কেন! মা কোথায়! সে ফিরে আসতেই বাবা বললেন, বিলু রাতের ট্রেনে কোথায় চলে গেছে! তোমাকে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে। বলেই তার দিকে বাবা একটা ভাঁজ করা কাগজ এগিয়ে দেবার সময় বললেন, যাক বাবুর যে দয়া করে এবারে কর্তব্যজ্ঞান বেড়েছে! সেবারে উধাও হলেন, ফিরে এলেন তিন মাস বাদে। এবারে কতদিন পর ফেরে দেখ।

পিলু জানে বাবা তাদের এরকমেরই। সে তাড়াতাড়ি চিঠিটা হাত বাড়িয়ে নিতে গেলে বাবা বললেন, বয়সের দোষ। এ নিয়ে মন খারাপ করবে না। তোমার মা কান্না-কাটি করছিলেন, সুদামের বৌ তাকে নিয়ে গেছে। তোমার মা'তো বোঝে না, ছেলে আর তার নেই! তার মায়া মমতা অন্য জায়গায় শেকড় চালাবার চেষ্টা করছে।

সাইকেলটা তুলে রাখল পিলু। দাদা তাকে কী খবর দিয়ে গেল! বাবা কী চিঠি পড়েই জানতে পেরেছে! সে উঠোনে নেমে গেল। চিঠি লিখে রেখে গেছে দাদা। আর কাউকে না, শুধু তাকে। দাদার কথা ভেবে তার চোখ ছল ছল করছিল। সে চিঠিটা পড়তেও সাহস পাচ্ছিল না। যেন পড়লেই সে দাদার দুঃখটা টের পাবে—তারপর সবার সামনেই কেঁদে ফেলবে।

সে জানে, বাবা এখন দাদার যাত্রার সময় নিয়ে ব্যস্ত। রাতের ট্রেনে দাদা গেছে—যাত্রা শুভ, না নাস্তি এটুকু জানতে পারলেই বাবা নিশ্চিন্ত হবেন। এত বেশি নিশ্চিন্ত যে মনেই হবে না, বাড়ির বড় পুত্রটি নিখোঁজ। মেজ পুত্র লায়েক নয়—লায়েক হলে সেও যে নিখোঁজ হয়ে যাবে, কেউ ঘরে থাকে না। মানুষ অহরহ নিখোঁজ হচ্ছে, নিজের কাছ থেকেও। বাবার এ-সব আপ্তবাক্য তাদের জানা আছে বলে, পিলু ঘরে ঢুকে তক্তপোষে বসল। দাদা প্রথমে বাবাকে লিখেছে।

'বাবা,আপনার কু-পুত্রের মুখ দর্শন করে কষ্ট পান, সেটা আর চাই না। আমি চলে যাচ্ছি। ভাল হয়ে ফিরব। জানবেন এটা আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আপনার কোনো পাপ নেই বাবা।'

তারপরই দাদা তাকে লিখেছে।

'সকালেই উঠেই চেঁচামেচি শুরু করিস না। দাদা নেই, দাদা কোথায়। তুই তো আমাকে নিয়ে জলে পড়ে গেছিস বুঝি। দাদা ফিরবে বলে তুই স্টেশনে গিয়েও বসে থাকিস না।'

এটা ঠিক, সেবারে পিলু দাদা ফিরবে বলে সড়কে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। কখনও হেঁটে হেঁটে স্টেশনে। বাড়ি ফিরলে বাবা রেগে বলতেন, বড়টা নিখোঁজ, তুমিও সারাদিন বাড়ির বাইরে। ভেবেছ কী! রোজ এমন বললে, সে একদিন কেঁদে ফেলেছিল, দাদা আসছে না কেন! কতদিন হয়ে গেল! তুমি যে বললে আসবে। সময় হলেই ফিরে আসবে। আমি রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি—দাদা যদি ফেরে।

দাদা ফিরে এলে বাবা বলেছিলেন, এ-ভাবে না বলে না কয়ে নিখোঁজ হতে নেই। গ্যারেজের কাজ ভাল লাগছিল না বাড়ি ফিরে এলেই পারতে। তাই বলে নিখোঁজ। পিলু তো রোজ স্টেশনে গিয়ে বসে থাকত। তোমার কী কোনো আক্কেল আছে!

তারপর দাদা লিখেছে—'তোর দাদা একদিন না একদিন ঠিক ফিরবে। মা-বাবাকে দেখিস। স্কুল কামাই করিস না। পরীর সঙ্গে দেখা হলে বলিস, আমার জন্য সে তার প্রিয় শহর ছেড়ে যেন চলে না যায়। আমিই চলে গেলাম।'

পরীদির দাদু বাবাকে ডেকে বলেছিল, বাঁড়ুজ্যে মশাই—আমার বড় পাপ বাঁড়ুজ্যে মশাই। শেষে মিমিকেই পাঠিয়ে দিতে হচ্ছে। আমার কাছে মানুষ, সংসারে নাতিন ছাড়া কোনো টান নেই। বিধি বাম। মিমিকে ওর বাবার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। মিমির ভবিষ্যত ভেবেই এটা আমাকে করতে হচ্ছে।

আসলে যেন পরীদিকে এ-ছাড়া ধরে রাখার আর কোনো উপায় নেই। আদুরে নাতনিকে আসকারা দিয়ে মানুষ করেছেন। এত বড় পরিবারের মেয়ে না হলে পার্টি করতে পারে! মিছিলে যেতে পারে। এ-আজাদি ঝুটা হ্যায় বলতে পারে! পিলু রাস্তায় দাঁড়িয়ে পরীদির সেই হাত তুলে চিৎকার শুনে অবাক হয়ে যেত। শহরের এত বড় পরিবারের মেয়ে মিমিদি পোস্টার লিখছে—দেয়ালে পোস্টার সেঁটে দিচ্ছে। একবার তাকে রাস্তায়

দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলেছিল, পিলু আয়। বলে হাত ধরে মিছিলে টেনে নিয়েছিল।

সেই কবে থেকে বাড়িতে মিমিদিদের এমনিতেই রাজনীতি ঢুকে আছে। কিন্তু মিমিদির আলাদা পার্টি। বাবা তো বলতেন, মিমি কোনো নাম হয়!

পরীদি হেসে বলেছিল, না মেসোমশাই, আমার নাম মৃন্ময়ী। বাড়িতে সবাই ডাকে মিমি বলে।

আসলে পরী নামটা কে দিল সে জানে না। তবে দাদা পরীই ডাকত। পরীর মতো দেখতে, পরী বলে ডাকতেই পারে।

—আবার পরী এসেছিল!

বাবা দাদার ক্ষোভের কারণ বুঝতে পারতেন না। বিরক্ত হয়ে বলতেন, তোমার এত রাগ কেন বুঝি না। মৃন্ময়ী এলে ক্ষেপে যাও কেন বুঝি না!

দাদা, কী ভেবে যে বলত, জনসংযোগ করছে। পার্টির হয়ে জনসংযোগ! এস ডি ও সাবের গাড়িতে এসে নেমেছে। বাড়ির কুল, আচার খেয়ে কত ভাল মেয়ে দেখিয়েছে—তারপরই ক্ষিপ্ত হয়ে দাদা একদিন চিৎকার করে বলেছিল, আমরা কত গরীব দেখতে আসে আপনি বোঝেন না! পরী ভাল মেয়ে! এস ডি ও পরেশ চন্দ্র নামিয়ে দিয়ে গেছে তা জানেন! আমাদের দারিদ্র্য দেখে সে মজা পায়।

—তুমি কী বলছ বিল্ব!

বাবা ক্ষোভ থেকে কথা বললে, সেই সাধু বাক্য। বিলু তখন বিল্ব হয়ে যায়।

—আমি ঠিকই বলছি বাবা।

পিলু চিঠিটা পড়তে গিয়ে শেষ করতে পারছে না। দাদার ভেতরে আগুন জ্বলছে। কে যে জ্বালিয়ে দিল! তার চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। দাদা যেন এক বিন্দুও মিছে অভিযোগ করেনি। পরীদির দাদু রেলের চাকরির লোভ দেখিয়ে দু'জনকে আলাদা করে দিতে চেয়েছিল। কী-ভাবে যে শেষে দাদার রেলের চাকরিটা ভেস্তে গেল সে জানে না। দাদাকে বিলাসপুরে শেষ পর্যন্ত কেন পাঠানো গেল না, তাও সে জানে না। তবে পরীদিকে বিলাসপুরে তার বাবার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বাবা

অহোরাত্র চণ্ডীপাঠের সঙ্গে মাকে এ-খবরটাও দিয়েছিলেন।

কেন পরীদিকে বিলাসপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে টের পেয়ে দাদা নিজেই উধাও হয়ে গেল!

দাদা লিখেছে, 'আমিই চলে গেলাম। পরীকে বলিস সে চলে গেলে, কখনও যদি ফিরে আসি, শহরটাকে আমি আর ঠিক ঠিক চিনতে পারব না। শহরটাকে আগের মতো আর ভালবাসতে পারব না। ইতি তোর দাদা।'

পিলু চিঠিটা ভাঁজ করে রাখল।

কী করবে এখন কিছু বুঝতে পারছে না। পরীদিকে খবরটা দেওয়া দরকার।

কারণ সব চেয়ে যেন দাদার খবর রাখার অধিকার পরীদিরই বেশি।

আজ সে টের পেল, পরীদি দাদার ভবিষ্যত নিয়ে কেন এত বেশি উতলা ছিল। দাদা প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টারি নিলে কেন এত ক্ষেপে গিয়েছিল।

সে চিঠিটা হারিয়ে না যায়, কারণ তার বাবা হয়তো বলবেন, কী পড়া হল! চিঠিটা দাও। রেখে দি। তারপর কোথায় রেখে দেবেন কে জানে। চিঠিটা পরীদিকে না দেখানো পর্যন্ত তার শান্তি হচ্ছে না।

তখনই সে শুনতে পেল, বাবা বারান্দায় বসে কাকে যেন বলছেন, যাত্রা শুভ। অমঙ্গলের কোনো আশংকাই নেই।

পিলু জানে, হয়ে গেল বাবার! রাতের ট্রেনেই গেছে—বাবার এমনই বদ্ধমূল ধারণা। বাড়ি ফিরে হাতে চিঠিটা পাবার পর মনে হয়েছে, দাদা কোথাও চলে গেছে—কিন্তু কখন গেছে, কোনদিকে গেছে, যেতে হলে সঙ্গে কিছু নিতে হয়, দাদা তা নিয়েছে কি না, টাকা পয়সা কার কাছ থেকে নিল—এ-সব অনেক প্রশ্ন তার মাথায় এল।

সে বের হয়ে বড় ঘরের বারান্দায় উঠে গেল। বাবার সামনে রাজেন কর্মকার বসে। কোনো পূজাপাঠ থাকতে পারে। সকাল বেলায় বাবার কাজই হাত মুখ ধুয়ে পূজার ফুল তুলে, বারান্দার জলচৌকিতে বসে এক ছিলিম তামাক টানা, নয় পঞ্জিকা নিয়ে বসা। কী খাওয়া যাবে না যাবে তার এক প্রস্ত নির্দেশ রান্নাঘরের প্রতি। কখনও মনে হয় পিলুর, আসলে

বাবার এটা দোকান সাজিয়ে বসা।

জঙ্গল থেকে নবমী বুড়িকে বাড়ি তুলে আনার পর বাড়তি কিছু কাজ জমে গেছে হাতে। ইটখোলায় ঘুরে এসেছেন—কিন্তু নিবারণ দাস বলেছে—আলের মাটি থেকে ভাল ইট হতে পারে। বাড়িতেই ইট পুড়িয়ে নিলে অর্ধেক দামে হয়ে যাবে। ইটের কারিগরদের সঙ্গেও কথা বলতে হয় সকালের দিকটায়। কাঠ কিনবেন, না নিজের লাগানো গাছ কেটে করবেন এই নিয়ে দ্বিধায় আছেন। শত হলেও হাতে করে গাছগুলিকে এত বড় করে তুলেছেন। এক একটা গাছ লেগে যেতেও কম সময় লাগেনি। আম জামের কলম এনেছেন দূর দূর বাগিচা থেকে কাঁধে বয়ে। সঙ্গে সেও যেত। তবে তখন বোঝা বহন করার ক্ষমতা তার ছিল না। দা, কখনও খোন্তা এ-সব বাড়তি জিনিসপত্র বাবা তার হাতে তুলে দিতেন।

কাটলে কোন কোন গাছ কাটা হবে এই নিয়ে মায়ের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করার সময় বলেছেন, মায়া হয় কাটতে। গাছের ঠিকমতো যৌবনই এল না, কেটে ফেলব! তবে গৃহ দেবতার পাকা মন্দির নির্মাণ—বুঝলে না ধনবৌ তার ইট কাটা হচ্ছে, তার জন্য কাঠ লাগে—আর যদি গাছগুলো ঠাকুরের কাজে লেগে যায়—সেও কম বড় সৌভাগ্য না!

পিলু জানে, তার মা আর আগের মতো বাবাকে হেনস্থা করে না। সবই ভাগ্য। ভাগ্য যে এখন প্রসন্ন নবমী বুড়িকে তুলে আনায় মা এটা আরও বেশি টের পেয়েছেন। ইটের পরিত্যক্ত ভাটায় কারবালার জঙ্গলে পড়ে থাকত। তার দ্বিতীয় পুত্রের সঙ্গেই ভাব বেশি। শেষ দিকটায় বুড়িকে সে বাড়ি থেকে দু-বেলা খাবারও দিয়ে আসত। সেই বুড়ি যে এত গুপ্তধনের মালিক, কে জানত! তা না হলে ঠাকুরের নামে এক লপ্তে এত ধানিজমিও কেনা যেত না! গৃহ দেবতার জন্য পাকা কোঠার কথাও ভাবা যেত না। পক্ষকালের মধ্যে তার দাদারও মাথায় আসত না প্রাইমারি ইস্কুলের চাকরি না করলেও বাবার ভালই চলে যাবে। বাবাকে আর দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে হবে না।

এত সব ভেবেই হয়তো দাদা শেষ পর্যন্ত উধাও হয়ে গেল। কিংবা বাবার যে চোটপাট দাদার উপর তাও যেন সেই এক মনোবাসনা থেকে, ভেব না, তুমি না থাকলে আমাদের কোনো গতি নেই। তোমার এত

আস্পর্ধা, তুমি শেষে মৃন্ময়ীর গায়ে হাত তুললে !

বাবা দাদার সম্পর্কে এতটা নির্বিকার ভেবে তার খারাপ লাগছিল। বাবা রাজেন কর্মকারের সঙ্গে দুর্গাষ্টমী ব্রত নিয়ে কথা বলছেন। তালিকা করে দিচ্ছেন, কী কী লাগবে। এখন কিছু বললেই বাবার সেই এক কথা—ঈশ্বর নিয়ে কথা হচ্ছে। সারাটা দিন তো বাড়িই থাক না। তোমার সব জানার সময় এখন হল !

সে মায়াকে খুঁজল। মায়াও বাড়ি নেই। সে বুঝতে পারল মায়া মা-র সঙ্গেই গেছে। নবমী বুড়ি লাঠি ভর দিয়ে এসে সামনে বসলে বাবা বললেন, ইষ্টনাম জপ করেছ তো। না ভুলে যাচ্ছ।

—ভুল হইয়ে যাচ্ছে। বড় দাদাঠাকুর নাকি কোথায় চইলে গেছে !

নবমী বুড়ি কানে কম শোনে। সকাল বেলায় উঠে তার কাজ লাঠি ভর দিয়ে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ানো। পাঁচ বিঘে জমির উপর এত সব গাছপালা যে নবমীর মাঝে মাঝে নাকি মনে হয় সে তার পূর্বেকার বনভূমিতে বসবাস করছে। বাবার নির্দেশেই নবমীকে সকালে হেঁটে বেড়াতে হয়। শত হলেও বাবাঠাকুরের বিধান—প্রকৃতির মধ্যে হেঁটে বেড়াও, বসে থেক না। বসে থাকলে শরীরে ঘুণ ধরে। যাতে শরীরে ঘুণ না ধরে তার জন্যই সে হাঁটে। কোনো গাছের নিচে বসে থাকে। পাখ-পাখালি দেখে।

আবার হাঁটতে থাকে। কখনও বাঁশ ঝাড়ের ভিতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফেরে। সে ঘুম থেকে ওঠে সবার আগে। সে কী করে জানবে, এত বড় একটা দুঃসংবাদের কথা। কার কাছে শুনে ধেয়ে এসে যেই দেখেছে, বাবাঠাকুর বড়ই নিস্পৃহ—তখনই না বলে পারেনি, গেল কোথায় বড়দাদাঠাকুর।

—গেছে কোথাও। সময় হলেই ফিরবে।

পিলু আর পারল না। বলল, দাদা কোথায় গেছে তুমি জানো !

বাবা খুবই গম্ভীর গলায় বললেন, আরবারে কোথায় গেছিল দাদা তোমার জানতে !

তা সত্যি ! সেবারেও দাদা মানুকাকার দেওয়া কাজ গ্যারেজের চাকরি ছেড়ে কাউকে না বলে না কয়েই পালিয়েছিল। বাবা তখনও নির্বিকারই ছিলেন। দাদা ফিরে এলে সে জেদ ধরেছিল।—কোথায় গেছিলি !

কোথায় এতদিন কাটিয়ে এলি ! কোনো জবাব দিত না দাদা। আসলে দাদার চাপা অভিমান এত যে কিছুতেই সে তাকে বুঝতে পারে না।

সে তবু বলল, তুমি যে বললে যাত্রা শুভ !

—শুভই তো। পাঁজি তো তাই বলে।

—দাদা কোনদিকে গেছে জানলে কী করে !

বাবা এবার কী মনে করে উঠে দাঁড়ালেন। রাজেন কর্মকারের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার মা-র কোমরে ব্যথা, উঠতে বসতে কষ্ট। এটা নিয়ে যাও। বলে বাবা ঘর থেকে কলাপাতায় মোড়া কী বের করে এনে কর্মকারের হাতে দিলেন। ঘুনসিতে পরিয়ে নিতে বল। দুর্গাষ্টমীর শেষে যেন পরেন। নির্জলা উপবাসে থাকে যেন।

বাবা এবার তার দিকে তাকিয়ে বললেন, দাদার এখন তোমার অশ্বমেধ যজ্ঞ শুরু। বুঝলে। এই যজ্ঞই মানুষকে সারা জীবন তাড়া করে। তিনি এখন ঘোড়ায় চড়ে ছুটেছেন। রাজ্য জয়ে বের হয়েছেন। তাকে কে নিরস্ত্র করবে। বড় হলে সবারই শুরু হয়। শেষ হয়, তোমার বাবা, নয় এই নামী বুড়িকে দিয়ে। বুঝলে কিছু !

সে সত্যি কিছু বুঝতে পারছে না।

বাবা কেমন স্বগোতোক্তি করলেন, জানতাম এই হবে। এখন আর তোমার দাদার ন'টা বিষয়ে পাশ করলে চলবে না। বাকি একটা বিষয়েও পাশ করতে হবে ভেবেছে। বুঝলে কিছু !

পিলু জানে, তখন তাদের কী না কষ্ট গেছে ! বাবাও মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যেতেন। সেই যবে থেকে দেশ ছেড়েছিলেন, একদিন এই গুরুবংশের শেষ বংশধরকে, প্ল্যাটফর্মে মাসের পর মাস দিন যাপন করতে হয়েছে। কখনও কোনো পোড়ো বাড়িতে। বাবা দমে যাননি—ও-বেলা ফিরবেন বলে গেলেন, এলেন পাঁচ সাতদিন পরে। কখনও মাস দু-মাসও বাবার পাত্তা পাওয়া যেত না। গুরুবংশ, কে কোথায় এসে উঠেছে সেই খোঁজে নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ মানুষটি ফেরার সময় নানা প্রকারের পোঁটলাপুঁটলিতে এক বিশাল বোঝা মাথায় নিয়ে ফিরতেন। নানা পোঁটলায় আতপ চাল, মুগের ডাল, আমলকি, হরিতকি, কাঁচা হলুদ, কাঁচকলা, কোরা থান—যেখানে যা কিছু কোনো পার্বণে কিংবা শ্রাদ্ধে

পেয়েছেন যত্ন করে পোঁটলায় বেঁধে মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

তার সেই বাবার এখন আশ্রয় মিলেছে।

তিনি ঘরবাড়ি বানিয়েছেন। আহার এবং উত্তাপেরও বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন। বোধহয় বাবার অশ্বমেধের ঘোড়াটি এখন ক্লান্ত অবসন্ন অথবা এও হতে পারে বাবা সেই ঘোড়াটিকেই দাদাকে উপহার দিয়েছেন—যেমন সব বাবাই তাঁর সন্তানদের দিয়ে যায়।

দাদার ন'টি বিষয়ে পাশ কেন কথাটা উঠল পিলু তাও বোঝে। সে এবার পরীক্ষায় পাশ করলে ক্লাশ এইটে উঠবে। সেও আর ছোটটি নেই। সে বোঝে দাদার শেষ বিষয়ে পাশটা এখন কী। অন্তত বাবা তাকে কী অর্থে কথাটা বলতে চাইলেন সে বোঝে।

—তোমার দাদা আর শুধু তোমাদের নেই।

ভাবতেই পিলুর মনটা দমে গেল। কেন যে দাদাকে স্বার্থপর মনে হল বুঝতে পারল না।

আমরা তোর কেউ না! আমাদের কষ্ট বুঝলি না। বাবা মা-র কষ্ট বুঝলি না! অভিমানে দেশান্তরী হলি! বাবা কী খারাপ কথা বলেছে বল। পরীদির দাদু আসলে ডেকে নিয়ে বলতে গেলে বাবাকে অপমানই করেছে। যে-বাবা পুত্র গৌরবে এতদিন এতটা দুঃখ কষ্ট সয়ে থিতু হলেন, সেই বাবাকে ডেকে পুত্রের অপমান গাইলে কোন বাবার মনে না লাগে তুই বল! তোর জন্য পরীদিকে শেষে বিলাসপুরে পাঠিয়ে দিতে হচ্ছে! বাবা এমন অভিযোগ শুনলে মাথা কী করে ঠিক রাখতে পারেন বল। ক্ষোভে না-হয় বলেছেনই।—তোমার জন্য শেষে অন্নপূর্ণাকে বনবাসে যেতে হচ্ছে? আর তাতেই তোর এত অপমান। চিঠি রেখে গেলি, পরীদি যেন শহর ছেড়ে না যায়। তুই নিজেই চলে যাচ্ছিস!

পিলু বাবার দিকে তাকিয়ে আর কোনো কথা বলতে সাহস পেল না। সংসারের আর দশটা কাজে বাবা ক'দিন নিজেকে খুবই যে ব্যস্ত রাখবেন তাও সে বোঝে। আসলে পুত্রের এই নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার বিষয়টা তাকে ভিতরে যতই কষ্টে ফেলে দিক, উপরে তিনি সব সময় স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করবেন। সংসার ধর্ম বাবার কাছে এ-রকমেরই। কখন কী ঘটবে

কেউ বলতে পারে না। আগে থেকেই তার জন্য প্রস্তুত থাকা ভাল। বাবার এই স্বভাবই তাঁকে যে কিছুটা নির্বিকার করে দেয় পিলু তা ভালই জানে।

॥ দুই ॥

দাদার সেই একটা বিষয়ে পাশ পিলুকে এখন কিঞ্চিৎ বিভ্রমে ফেলে দিয়েছে। তার চেয়েও বেশি বিভ্রমে ফেলে দিয়েছে, দাদা কোথায় যেতে পারে এমন কোনো নিশ্চিত ধারণা বাবার আছে—তা না হলে বাবা ধরে নিলেন কেন যাত্রা শুভ। সে নিজেও পঞ্জিকা দেখে থাকে আজকাল। 'যাত্রা শুভ' এই বাক্যটি কোন্ দিক নির্ণয় করছে— উত্তরে দক্ষিণে, না পূবে পশ্চিমে, অথবা নৈঋত কিংবা ঈশান কোণ— কারণ যাত্রা শুভ তো বড় একটা সব দিকে হয় না। তবে কী দাদা কোন দিকে গেছে বাবা মনে মনে ঠিক করে যাত্রা শুভ কথাটা বললেন!

পিলু বলল, দাদা কোথায় গেছে তুমি জান!

—কোথায় যাবে! কলকাতা ছাড়া আর কোথায় যাবে তোমার দাদা। কলকাতায় না গেলে তার নাকি কিচ্ছু হবে না। তোমার মাকে তো প্রায়ই বলত। গরীবের ঘোড়া রোগ। লেখাপড়ার পাট তুলে ইস্কুল আর আড্ডা। মুকুল বলে গেল একদিন, মর্নিং-এ বি কম ভর্তি হয়ে যাও বিলু। কলেজে নতুন কমার্স ক্লাস নাকি সরকার অনুমোদন করেছে। মাথা পাতল না। তোর মাও বলল। মিমি এসে বলে গেল, মাসিমা আপনি বলুন, যদি রাজি হয়।

পিলু অবশ্য এতটা জানে না।

তবে গরীবের ঘোড়া রোগটি কী সে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। রাত জেগে এক গাদা পাণ্ডুলিপি দেখত। পড়ত। পছন্দ হলে রাখত। না হলে অমনোনীত লিখে এক পাশে ফেলে রাখত। 'অপরূপায়' সব গল্প প্রবন্ধ, কবিতা, এমন কী এদিকটায় নিজেই ডামি তৈরি করত। এস ডি ও সাহেবের সঙ্গে জিপে কোথাও পরীদি যাচ্ছে দেখতে পেলেই আরও ক্ষেপে যেত। তখন নিজেই রাত জাগত, কেন জাগত কে জানে— টেবিলে বসে

এক একটা লাইন লিখত আবার কেটে দিত। কেমন ছটফট করত ভিতরে!

আসলে এদিকটায় দূর হয়ে যায় বলে, পরীদি বোধ হয় সুযোগ বুঝে মাঝে মাঝে পরেশ চন্দ্রের জিপে উঠে বসত। পরীদিকে নিমতলায় নামিয়ে দিলে হেঁটেই চলে আসতে পারত তাদের বাড়িতে। আর এটাতে দাদার এত কী ক্ষোভের কারণ তাও বোঝে না। সে তো শুনেছে, পরীদির দাদু পরেশ চন্দ্রকে খুব পছন্দ। পরেশ চন্দ্রের সঙ্গে মেলামেশা রাখলে নাকি পরীদির স্বাধীনতার বহর কিছুটা বেড়েও যায়। পরীদি কতটা পছন্দ করে পরেশ চন্দ্রকে সে জানে না। তবে শত হলেও এস ডি ও সাব। বাবা তো, পরেশ চন্দ্র এক গাদা কাগজ পত্র দিতে এলে দূর থেকেই ছুটে আসছিলেন। দাদা টের পেয়ে রাস্তা থেকেই পরীদির পাঠানো পাণ্ডুলিপির বাণ্ডিল হাতে নিয়ে বিদেয় করে দিয়েছিল। বলেছিল, বলবেন পেয়েছি। দেখে পাঠিয়ে দেব।

আসলে দাদার এই ঘোড়া রোগ কে ধরিয়েছে!

কে বলেছিল কাগজ বের করতে!

দাদা কেন যে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা লিখত তার খাতায়। মাথা মুণ্ডু সে কিছুই বুঝত না। অথচ দাদার বন্ধুরা তাকে বাহবা দিত। পরীদি নাকি বলত, বিলু আমাদের গর্ব। সব এক ব্যাচের কবি। এক ডালের পাখি। দাদার ছাপা কবিতা পড়ে মাথামুণ্ডু সে কিছুই বুঝত না—অথচ এই নিয়ে অযথা সবার গর্ব প্রকাশই দাদার মাথাটাকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। দাদার এই নির্বাসনের জন্য কেন জানি এ-মুহূর্তে শুধু বাবাই দায়ী ভাবতে পারল না। দাদার বন্ধুরাও কম দায়ী নয়।

সেদিন তো সুধীনদারা এসে জোর করেই দুটো কবিতা দাদার খাতা থেকে টুকে নিয়ে গেল। কলকাতায় যাচ্ছে সুধীনদা। এক ফাঁকে বড় বড় কাগজের অফিসে ঢুঁ মেরে আসবে বলেছে।

দাদা কিছুতেই রাজি না।

—ধুস তোমরা যে কী কর না! ও-সব কবিতা মফস্বল পত্রিকায় চলে! আমার তেমন কবিতাই নেই। লিখতেই পারি না!

মুকুলদা দাদাকে অভিযোগ করেছিল, বিলু তুমি শামুকের মতো গুটিয়ে

থাক কেন বলতো। সুধীনদাকে দিতে আপত্তি কেন!

—না আমার দেবার মতো কিছু নেই।

—বললেই হল! বলে জোর করে দাদার কবিতার খাতাটা কেড়ে নিল।

তার দাদাটা কেমন কিছুক্ষণ বোকার মতো তাকিয়ে বলেছিল, কী যে তোমরা পাগলামি শুরু করলে বুঝি না। বলছি নেই। কলকাতার কাগজে দেবার মতো কোনো লেখা নেই।

নিখিলদা দাদাকে জোরজার করে ঘর থেকে টেনে বের করে নিয়ে গেছিল।

সে বাড়িতেই থাকে। দাদার বন্ধুরা এলে তাকে ফুট ফরমাস খাটতে হয়। বাবা পছন্দ করেন, দাদার বন্ধুদের। সবাই শহরের বেশ বড় ঘরের ছেলে। তারা বাবার মতো একজন গরীব উদ্বাস্তু বামুনের বাড়িতে এলে তিনি গৌরব বোধ করে থাকেন। নানা রকমের কথা তখন কানে আসে।

পিলু একটা দুটো কথা থেকে বুঝতে পেরেছিল আসলে এটা পরীদিরই কাজ। পরীদিই সুধীনদাকে কলকাতায় পাঠিয়েছে। 'অপরূপা' কাগজের জন্য কিছু বিজ্ঞাপন, কারণ যারা বিজ্ঞাপনদাতা, তাদের কেউ কেউ পরীদির সম্ভবত আত্মীয় হয়। চিঠি লিখে সব ঠিকঠাক করে রেখেছে। শুধু একবার গিয়ে সই করে ব্লক আরও কী সব বোধ হয় কোনো ছাড়পত্র—সে যাই হোক পিলু বুঝেছে দাদার এই স্বার্থপরতার জন্য তার বন্ধুরাও কম দায়ী নয়। পরীদি তো বটেই।

দাদার শেষ বিষয়ে পাশটা কী তবে এই ঘোড়ায় চড়ে বসা! ভাবতেই পিলুর কবেকার সব দৃশ্য মাথায় পাক খেতে থাকে।

তখন সবে বনজঙ্গল কেটে বাবা টিনের একটা বাড়ি ঘর তুলেছেন। জঙ্গলে বাড়ি করতে দেখে পুলিশ ক্যাম্পের বাবুরা মাথা খারাপ লোক ভেবেছে বাবাকে। এদিকে বাদশাহী সড়ক, ওদিকে রেল-লাইন আর উত্তরে ঝিল ছাড়া সবটাই গভীর বনাঞ্চল। কেউ কেউ বাবার সাহসেরও তারিফ করেছে। গভীর নিশীথে শুধু কীট পতঙ্গের আওয়াজ। কখনও দলে দলে সজারুর আক্রমণ। সাপখোপের উপদ্রব তো আছেই। তার মধ্যে বাড়ির বড় পুত্রটি খবর নিতে গেছে শহরে— ম্যাট্রিকের রেজাল্ট

তার কী হল ! বাড়ির সবাই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। কখন বড় পুত্রটিকে দেখা যাবে দূরের বাদশাহী সড়ক থেকে নেমে মাঠ ভাঙছে। সেই আশায় দুপুর থেকে সবার অপেক্ষা।

বড় পুত্রটি আর ফেরে না।

প্রথমে মা বলেছিল, এতক্ষণ তো লাগার কথা না। আসছে না কেন।

বাবা বলেছিলেন, তাই তো।

পরীক্ষার ফল ভাল মন্দ কোনো ব্যাপার না। শুধু পাশ। ব্যস আর কিছু চাই না। এতেই বাবা মা এবং তারা খুশি।

কিন্তু তার দাদাটা ফিরছে না কেন।

পিলু আর না পেরে হাঁটতে হাঁটতে বাদশাহী সড়কে উঠে গেছিল। ওখান থেকে পঞ্চাননতলার মোড় পর্যন্ত দেখা যায়। ইতস্তত দুটো একটা গরুর গাড়ি ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিছু সাইকেলের আরোহী পাশ কাটিয়ে তার চলে গেল। পিলুর বুক কাঁপছিল। সেই তার প্রথম বুক কেঁপে উঠেছিল। পরীক্ষায় খারাপ করে দাদাটা না আবার কিছু করে বসে।

সে বিমর্ষ হয়ে ফিরে এসে বলেছিল, না দেখা যাচ্ছে না।

কিন্তু অপেক্ষার তো শেষ নেই। গাছের নিচে তবু সবাই দাঁড়িয়ে। বাবা ভাবছেন, একবার শহরে নিজেই চলে যাবেন কি না। খবরটা মানুকাকার দেবার কথা। দাদা নিশ্চয়ই মানুকাকার কাছে খবর নিতে একবার হলেও গেছে।

কিন্তু মানুকাকা যদি বলে, সে তো সকাল বেলা এসেছিল। কেন বাড়ি ফিরে যায়নি !

—না তো !

তা হলেই হয়েছে।

এত সব যখন দুশ্চিন্তায় সবার মুখ কালো, তখনই দেখা গেল দাদা ফিরছে।

পিলু ছুটে গিয়েছিল।

কিন্তু তার দাদার তেমন কোনো হুঁস ছিল না।

সে বলেছিল, কী রে দাদা পাশ করলি !

দাদা জবাব দেয়নি। তাকে ফেলে সে বাড়ির দিকে হাঁটছে। এত ক্লান্ত যে দাদাকে দেখে আর কোনো প্রশ্ন করতেই সে সাহস পায়নি।

বাবা মা সবাই এগিয়ে গেলে দাদা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল।

—কী হয়েছে ! পাশ করেছ ! মুখ গোমড়া করে রেখেছ কেন !

বাবা পর পর প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন।

—ফিরতে এত দেরি। কোথায় ছিলে !

দাদা তবু রা করছে না।

বাবা বললেন, আমরা সব দুশ্চিন্তায় ঘর বার করছি—তুমি ফিরছ না, চিন্তা হয় না। সেই কোন সকালে বের হয়ে গেছ। মানু কী বলল ? রেজাল্ট আসেনি !

—এসেছে।

—তবে ?

—পাশ করতে পারিনি।

বাবা কেমন সহজে গোটা ব্যাপারটা লঘু করে দিয়ে বলেছিলেন, তাতে কী রামায়ণ মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে। জীবনে সবাই পাশ করে !

তারপর হেসে বাবা বলেছিলেন, কটা বিষয়ে পরীক্ষা দিয়েছিলে !

শুধু এই একটি বাক্যেই পিলু যেন টের পেয়েছিল সেদিন বাবা তার কোন স্তরের মানুষ। পুত্রটির পরীক্ষাই তার কাছে বড়, কী পড়ছে না পড়ছে বাবার পক্ষে খোঁজখবর রাখাও সম্ভব না। টোলের পড়াশোনা এক-রকমের পুত্রটির পড়াশোনা আর একরকমের।

দাদা বলেছিল, দশটা বিষয়।

বাবা বলেছিলেন, কটাতে পাশ করেছ ?

দাদা কেঁদে ফেলেছিল বলতে গিয়ে, ন'টা বিষয়ে। আর বাবার তখন আশ্চর্য সরল হাসি। তার জন্য কান্না। জীবনে কে কবে সব বিষয়ে পাশ করে। যাও হাতমুখ ধুয়ে খেতে বস।

এ-সব পুরানো স্মৃতি দাদা নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় বার বার মনে পড়ছে।

তখনই পিলুর মনে হল, বাবা তাকে কিছু বলছেন, অথচ সে শুনতে পাচ্ছে না।

বাবা মাঝে মাঝে নিস্তেজ গলায় কথা বলে থাকেন—জলে পড়ে গেলে

সাঁতার না জানলে যা হয়ে থাকে—বাবার চোখে মুখে সহসা কেমন ত্রাস ফুটে উঠতে দেখেছিল সে।

সে বাবার কাছে গিয়ে বলল, কিছু বলছ!

—চিঠিটা কোথায়!

—আমার কাছে।

—ওটা দাও।

দাও বললেই, দেওয়া যায় না। সে বলতেও পারে না, ওটা আমার কাছে থাক।

হঠাৎ বাবার কাছে দাদার চিঠিটা এত জরুরী কেন, সে তো এ-বাবাকে চেনে না! বাবা কী নিজে যাবেন, চিঠি হাতে রায়বাহাদুরের কাছে যাবেন! তাঁর পুত্র বিল্বর হয়ে ক্ষমা চেয়ে আসবেন।

বাবা চিঠিটা পড়েছেন কী! তিনি যে স্বভাবের মানুষ, তাতে তাঁর মেজ পুত্রকে সম্বোধন করে লেখা চিঠি, নাও পড়তে পারেন। বয়স হলে পুত্র কন্যাদের নিজস্ব জগত তৈরি হয়—গোপন এক মহাবিশ্ব, বাবা যদি ভেবে থাকেন, সেখানে প্রবেশ করা তাঁর বয়সে অনুচিত, তিনি চিঠিটা না পড়েও দিয়ে দিতে পারেন।

তবে না পড়লে চিঠিটা দেবার পর এতক্ষণ চুপচাপ থাকতে পারতেন না। নিশ্চয় কী লিখল জানতে চাইতেন। গোপন বিষয় ছাড়াও তো চিঠিতে কিছু লেখা থাকে—তার আশাতেই প্রশ্ন করতেন, কী লিখেছে তোমাকে! কিন্তু বাবা চিঠিটা তার হাতে দেবার পর একটাও প্রশ্ন করেন নি। দাদার চিঠি সম্পর্কে কিছু জানার আগ্রহ হবে না হয় না। তবু কী ভেবে পিলু বলল, তুমি পড়নি!

—পড়ব না কেন! পড়েছি। আর একবার পড়ে দেখা দরকার। চিঠিটা কোথায় রাখলে!

—আছে।

পিলু জানে চিঠিটা বাবার কাছে ফেরত দিলে, ওটা আর সে নাও পেতে পারে। এমন কী চিঠিটা বাবা গোপনও করে ফেলতে পারেন। একজন অনূঢ়া যুবতীকে এর সঙ্গে জড়ানো হয়েছে। এটা বাবার মতো মানুষের পক্ষে কোনো অপযশের কারণ হতে পারে—কিংবা বড় পুত্রের পক্ষেও।

তার জন্য রায়বাহাদুর নাতনিকে বিলাসপুরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এক ধরনের ঔদ্ধত্য প্রকাশ দাদার, এমন মনে করেও চিঠিটি তিনি গোপন করে ফেলতে পারেন। মুখে বলা, আর লিখিতভাবে থাকার মধ্যে যে আকাশপাতাল প্রভেদ এ মুহূর্তে পিলু তা টের পেয়েই বলল, দেখি—কোথায় যে রাখলাম!

সে এবার তার ঘরে ঢুকে গেল। আসলে সে চিঠি খুঁজছে না। চিঠিটা তার পকেটেই আছে। দাদা কী নিয়ে গেল সঙ্গে! বোধহয় বাবা একবার নিজেই ঘরটায় ঢুকেছিলেন। মা, মায়া, এবং অন্য সবাই। সে দেখল, দাদার সুটকেসটা নেই। কিন্তু যদি কলকাতায় যায়—টাকা পয়সা কোথায় পাবে।

মাইনে পেয়েতো দাদা সব টাকা মা-র হাতে তুলে দেয়। প্রথম মাইনে পাবার দিনটা তার মনে আছে। সকাল থেকেই সবাই খুব প্রসন্ন। দাদার প্রথম সরকারি উপার্জন। এর আগে দাদা দু একটা টিউশান করে যা পেত, তাও তুলে দিত মা-র হাতে। দাদা স্কুল থেকে ফিরে আসছে না কেন, কারণ সেদিন কেন জানি মনে হয়েছিল, দাদার ফিরতে দেরি হচ্ছে। ঘুরে ফিরেই বার বার বাড়ি।—দাদা এল! অবার ঘুরে ফিরে বাড়ি—দাদা এল!

বাবা বাড়ি ঢোকার মুখে জামগাছের নিচে দাদার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। বলেছিলেন—আসেনি। আসবে। এতো আর পূজার দক্ষিণা নয়, ঝনাৎ করে দু-পয়সা, বেশি হলে এক টাকা, আঁচলের খুঁট থেকে খুলে দেওয়া! কোনো সই সাবুদ নেই। সরকারের টাকা তো আর আঁচলের খুঁটে বাঁধা থাকে না, যে হাত পাতলেই পাবে। দেরি হতেই পারে।

বাবার কাছে এবং গোটা পরিবারের পক্ষে এই সরকারি উপার্জনের প্রথম দিনটি ফলে উৎসবের মতো ছিল।

দাদা ফিরে এলে, মা মায়াকে বলেছিল, জলচৌকিটা এগিয়ে দে। বাবা বারান্দার এক কোনায় ফুল তোলা আসনে বসে তামাক টানছিলেন। চোখ তুলে—এবং এত প্রসন্ন যে পুত্রের ফিরে আসা সম্পর্কে আদৌ তাঁর আগ্রহ আছে বোঝা গেল না। পিলু জানে তার খুবই দুঃস্বভাব। সে বাবা-মাকে এক দণ্ড সুস্থির হয়ে বসতে দেয় না। সে বাবাকে যেন কিছুটা ঘুম ভাঙ্গিয়ে

দেবার মতো বলেছিল, দাদা এসেছে। দাদা এসেছে।

বাবা চোখ খুলে বলেছিলেন, চেঁচাচ্ছ কেন! দাদাকে একটু বিশ্রাম করতে দাও। কতদূর থেকে এসেছে। দুপুরের রোদ মাথায় করে এসেছে। ঠাণ্ডা হতে দাও।

দাদার প্রাইমারি স্কুল, দু ক্রোশ দূরে। বনজঙ্গলে বসতি গড়ে তোলা একজন মানুষের পক্ষে ওটা যে আদৌ কোনো দূরত্ব নয় পিলু জানে। সাইকেলে যেতে কী আর সময় লাগে! আসলে দাদা তার কত বড় চাকরি করে কত তার গুরুত্ব বোঝাতে চেয়েছিলেন। সরকারি চাকরি সোজা কথা! আশি টাকা মাইনে সোজা কথা! পাঁচ মণ চালের দাম সোজা কথা!

পিলু জানে বাবার কাছে টাকার দাম মণ প্রতি চালের কত দর তার হিসাবে। বাবা সারা মাসে যজনযাজনে পান বেশি হলে দশ বারো সের চাল। সিকি, দু-আনি দক্ষিণা পেলে বাবা হতবাক। দু এক পয়সাই বরাদ্দ বেশি। যারা সিকি দু-আনি দেয় তারা বাবার কাছে বড়ই মূল্যবান, দেব দ্বিজে ভক্তি তাঁরা আছেন বলে আছে।

অবশ্য তার বাবাটি দক্ষিণা কিংবা ভোজ্য গ্রাহ্য করেন না। পূজা, পূজাই। এক পয়সাও পূজা, এক আনারও পূজা। কিছু না দিলেও তিনি পূজা বিধিমতোই শেষ করেন। সবাই সমান দিতে পারবে কেন। তবু যে ধর্ম রক্ষা করছে দু-এক পয়সা দিয়ে সেটাই বাবার কাছে বড়। মা-র এক কথা, সারাদিন না খেয়ে শেষে এই দু-মুষ্টি ভিক্ষা নিয়ে এলে! কার মুখে দেব বল! ওদেরই বা বলি কী আক্কেল! সব কিছুর দাম বাড়ে, ঠাকুরের বেলায় সেই এক পয়সা, দু-পয়সা।

বাবার তখন বোধহয় ভিতরে পীড়ন শুরু হয়। ঠাকুর দেবতা তুষ্ট থাকলে সংসারে সুখ বাড়বে সেই আশায় তিনি পৈতৃক পেশায় লেগে আছেন। এর মধ্যে তাঁর যে ঈশ্বর উপাসনার তাগিদও আছে বাবার চোখ মুখ দেখলে পিলু টের পেত। মা-র অভিযোগের উত্তরে শুধু বলতেন, আঃ কী যে বলছ ধনবৌ!

আগে মা চোপা করত। বাবাকে গ্রাহ্য করত না। কিছুকালের মধ্যে বাড়িটা হয়ে যাওয়ায় এবং বড় পুত্রের অর্থ উপার্জন শুরু হয়ে যাওয়ায়,

মা-ও আর যজমানরা কি দিল না দিল এই নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করে না। এখন শুধু চলেই যাচ্ছে না, বেশ স্বচ্ছলতাও দেখা দিয়েছে।

তখনই সে শুনতে পেল, কী পেলে! কোথায় রেখেছ! এতক্ষণ লাগে খুঁজতে।

সেও জবাব দিল, পাচ্ছি না তো।

—এই তো তোমাকে দিলাম।

—তা তো জানি।

—তোমরা সবাই দেখছি আলগা স্বভাবের হয়ে যাচ্ছ। চিঠিটার গুরুত্ব বোঝো। অন্য কারো হাতে পড়লে কী হবে জান!

—কী আবার হবে। পিলু ঘরে বসেই আছে। চিঠিটা পরীদিকে না দেখিয়ে, দেওয়া ঠিক হবে না।

সে পরীদিকে খবরটা না দেওয়া পর্যন্ত সুস্থির হয়ে বসতেও পারছে না। সে বাবাকে কিছুটা অন্যমনস্ক করে দেবার জন্য বলল, দাদা যে গেল, টাকা পয়সা পেল কোথায়। যেখানেই যাক থাকবে কোথায়, খাবে কী!

—তোমার দাদা তা জানে। তা ভালই বোঝে। ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

—ও তো মাইনে পেয়ে মা-র হাতেই এসে দিয়ে দেয়।

—মাকে জিজ্ঞেস কর দিয়েছে কি না!

পিলুর মনে আছে সরকারি উপার্জনের টাকা দাদা পকেট থেকে বের করে প্রথম বাবার হাতেই দিতে গিয়েছিল। বাবা যেন অস্পৃশ্য হয়ে যাবেন এমন তাড়নায় উঠে দাঁড়িয়েছিলেন—না, না, এটা কী করছ! তোমার মা-র হাতে দাও। তিনি যা ভাল বুঝবেন করবেন। সংসার তুমিও কর না, আমিও করি না। তিনিই সব ধরে রেখেছেন। যেন বলতে চাইতেন—সংসারে তিনি দেবীরূপেন সংস্থিতা। তিনি প্রসন্ন থাকলে ঘরবাড়ি তোমার ঠিক থাকবে মনে রেখ।

অবশ্য সে জানে, মা-কে দাদা টাকা দিয়েছে কিনা, বাবা জানেন না হয় না। এ-মাসের আজ তিন তারিখ। নিজের কাছে টাকা রাখার তো স্বভাব নয় দাদার।

বাবাই বললেন, ভাগ্যিস তোমার মা বলেছিলেন, এখন রাখ, পরে নেব। হাতজোড়া দেখছ না! নিই কী করে! তোমার মা পাটিসাপটা করবেন বলে চাল বাটছিলেন। ভুলে সেও দেয়নি, আর তোমার মায়েরও খেয়াল ছিল না। টাকাটা সে বোধ হয় সঙ্গেই নিয়ে গেছে। এটাও বুঝবে, তাঁরই ইচ্ছে।

—কী পেলে?

ঘর থেকে পিলু কিছুতেই বের হচ্ছে না। এটা ফেলছে, ওটা টানছে। যেন বাবা টের পায় সে বসে নেই—খুঁজে দেখছে, ভুলে চিঠিটা কোথায় গুঁজে রেখেছে।

—তোমাদের ঐ দোষ। চিঠিটা বাঁ-হাতে নিয়েছ। বাঁ-হাতে কোনো জিনিস কোথাও রাখলে মনে থাকে না। খুঁজে পাবে কী করে! কাণ্ডজ্ঞানের এত অভাব থাকলে চলে!

আসলে পিলু এত ত্রাসের মধ্যে ছিল যে বাঁ-হাত না ডান-হাতে বাবার কাছ থেকে চিঠি নিয়েছে মনে করতে পারছে না। সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে ছিল—বাঁ-হাত হতেই পারে। তার ভুলও হয়নি। তবে তার হয়ে বাবাই যেন পথ বাতলে দিলেন। চিঠিটা না দিলেও চলবে—বাঁ-হাতে নিয়ে সে কোথায় রেখেছে কিছুতেই আজ আর মনে করতে পারবে না।

তবে দাদা টাকা পয়সাও সঙ্গে নিয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে যতটা ত্রাসে পড়ে গেছিল, এখন আর ততটা ত্রাসের মধ্যে নেই। দাদা এবার না বলেকয়েও ফেরার হয়নি—টাকাপয়সাও সঙ্গে আছে—দুর্ভাবনা নেই। চিঠি রেখে গেছে। দাদা স্টেশনে গিয়ে বসে থাকতে বারণ করেছে।

সে জামা প্যান্ট পাল্টে শহরে যাবে বলে সাইকেল বের করতে গেলেই বাবা বললেন, কোথায় যাচ্ছ? চিঠি খুঁজে পেলে না?

—এসে খুঁজব। এবং বাবাকে আর বেশি কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সে বড় ঘর থেকে সাইকেল বের করে দ্রুত উধাও হবার সময় শুনল, বাবা ডাকছেন, কোথায় বের হলে!

সে রাস্তায় পড়ে প্যাডেলে জোরে চাপ দেবার সময় হাত তুলে দিল—আসছি। সে দেখল না বাবা কতটা ক্ষুব্ধ। কিংবা তার যেন মনে হল, থামলেই বাবা দৌড়ে এসে সাইকেলের ক্যারিয়ার টেনে ধরবেন।

কোথায় যাচ্ছ বলে যাবে না।

দু পাশে গাছপালা, নতুন বাড়িঘর, ছাগল গরু এবং কুকুর রাস্তায় বাঁচিয়ে মানুষকে বাঁচিয়ে পলকে ক্যাম্পের ভিতরে ঢুকে গেল। তারপর বড় সড়কে। প্রায় সে উড়ে যাচ্ছিল। সে বুঝতে পারছে না পরীদির কথা চিঠিতে থাকায় কী এমন ত্রুটি হয়েছে। বাবা কেন ভাবছেন, এর মধ্যে একজন মেয়েকে জড়িয়ে দিয়ে বিশ্ব ঠিক কাজ করেনি।

বাবার অসুবিধা সে বোঝে। তাঁর বড় যজমান নিরঞ্জন দাস চিঠিটা দেখতে চাইতে পারে। কিংবা দেবীদারা খবর পেয়েই চলে আসবেন, অন্য প্রতিবেশীরাও। খবর ছড়িয়ে গেলে যা হয়। সকাল বেলাতেই বাড়িতে এক প্রস্থ হুলস্থুল গেছে। এবার ধীরে ধীরে আরও সব পরিচিত মানুষজন এসে দাদার খবর নেবে। বাবাই বলবেন, দাদা কলকাতায় গেছে। চিঠি রেখে গেছে। কেন যে এই মতিভ্রম ছেলের বুঝি না, তারপরই বাবা এখন যে নতুন আপ্তবাক্যটি বলে থাকেন, তাই হয়তো শেষে বলে মানসিক শান্তি পাবার চেষ্টা করবেন—কেহ আত্মাকে আশ্চর্যবৎ মনে করে, কেহ বা আশ্চর্যবৎ বলিয়া আত্মাকে বর্ণনা করে, আবার কেহ আশ্চর্য বলিয়া শোনে—কিন্তু ইহার বিষয় শুনেও কেহই ইহাকে বোঝে না।

পিলু দাদাকে দেখে এটা হাড়ে হাড়ে টের পায়। সে কি দাদাকে ঠিক বোঝে না। কার উপর দাদার এত ক্ষোভ! চিঠি পড়ে বুঝেছে পরীদির উপর কোনো ক্ষোভ নেই, বাবার উপরেও না। দাদা সব দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে কেন যে ফেরার হয়ে গেল! দাদাকে এত দেখার পরও সত্যি সে তাকে বোঝে না।

॥ তিন ॥

ভোর রাতে মিমির মনে হল বেশ শীত শীত করছে। শীত করার জন্য ঘুম ভেঙেছে, না কোনো শব্দে, সে ঠিক বুঝতে পারছে না। ইদানীং তার রাতে ঘুম ভাল হয় না। মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায়—কেন যে দেখতে পায় সহসা কোনো দূরবর্তী পাহাড় শীর্ষে সে দাঁড়িয়ে আছে আর অদৃশ্য কোনো বেহালাবাদক সামনের মরুভূমি অতিক্রম করছে। মানুষটাকে দেখা

যাচ্ছে না, আশ্চর্য সুরের ধ্বনি কানে আসছে। অথবা সে স্বপ্ন দেখে, একজন পরিব্রাজক এইমাত্র তার পাশ দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। তার মুখে হিম ঠাণ্ডা বালির ঝাপ্‌টা এসে লাগছে। সে পথ চিনে যেতে পারছে না।যেদিকে দু-চোখ যায় শুধু মরু সদৃশ অঞ্চল। কোথাও গর্ত থেকে মুখ বার করে রেখেছে মরু শৃগাল। কে যেন হেঁটে যাচ্ছে পায়ের ছাপ অনুসরণ করে। ঝড় ঝাপটায় তার বসন ভূষণ আলগা হয়ে যাচ্ছে। সে বোঝে প্রকৃতি ক্রমেই তার শরীরের উপর থাবা বসাতে চায়। সে তখন মুখ দু-হাতে ঢেকে চিৎকার করে ওঠে।

বিলু তাকে চড় মারার পর থেকেই কিছুটা যেন অনিদ্রার সে শিকার হয়েছে।

এত দিন সে বিলুকে একরকমভাবে চিনেছিল—চড় মারার পর অন্যরকম ভাবে। সে কেন যে খেলাটা খেলতে গেল! সে তো বছর দুই তিন হয়ে গেল বিলুর সঙ্গে মিশছে। বোধ হয় তার দিক থেকেই প্রবল আকর্ষণ ছিল। বিলু তো সব সময় তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। বিলু কী তার অধিকারের কথা বুঝিয়ে দিয়ে গেল! সে আর কোনো হালকা চালে বিশ্বাসী নয়। বিলুর চোখে কী যেন আছে—না হলে তার এই মরণ কেন! সে কী করবে না করবে, সেটা তার মাথা ব্যথা। অথচ কেন যে বলা, না তোমাকে এটা সাজে না, ওটা কর না, কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল এ-সব বলার জন্য! পরেশবাবুকে ডেকে না আনলেই পারত। সে শুনেছে—বিলুর রেলে চাকরি হচ্ছে। অথচ বিলু নিজে বলেনি—এমন কী দাদু পর্যন্ত গোপন করে গেছিলেন! কেন যে মাথায় আগুন ধরে গেছিল, দ্যাখ তবে। সে জানে পরেশবাবুর সঙ্গে আবার হেসে খেলে আড্ডা দিলে, তার গাড়িতে ঘুরতে বের হলে দাদুর মাথার ক্যাঁড়া নেমে যাবে।

মিমি উঠে বসল।

তার হাই উঠছে। সে আলো জ্বালাল। বাথরুম পেয়েছে। বাথরুমে ঢুকে চোখে মুখে জলও দিল।

তারপর আর শুতে ইচ্ছা করল না। দরজা খুলে দোতলার বারান্দায় এসে সোফায় গা এলিয়ে দিল। ঝাড় লণ্ঠনের নিচে সে অন্ধকারে বসে

আছে। কাল পার্টির সেমিনার আছে লালগোলাতে। তার যাওয়া দরকার। কিন্তু বাড়িতে যে-ভাবে অশান্তি শুরু হয়েছে তাতে যাওয়া কঠিন। দাদু তাঁর ঘর থেকেই বার হচ্ছেন না। মেসোমশাইকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন না কি। সে পার্টি অফিস থেকে রাতে ফিরে ঠাকুর চাকরের মুখে খবরটা পেয়েছিল।

দাদু নাকি কান্নাকাটি পর্যন্ত করেছে।

সে বোঝে দাদুর দুঃখটা কোথায়। তিনি শহরের খুবই প্রভাবশালী মানুষ। সারাদিন সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ভিড়। দিন রাত লোকজনের অপেক্ষা। গাড়ি শহরে বের হলে লোকজন সম্ভ্রমে সরে দাঁড়ায়। তার পক্ষে বাড়ি বয়ে এত বড় অপমান সহ্য করা কঠিন। আধা সামন্ততান্ত্রিক, আধা সাম্রাজ্যবাদী এবং বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থাই এ জন্য দায়ী সে এটা বোঝে। এও বোঝে বিলু বোকার মতো কাজটা করে ফেলেছে। সে নিজেকেও এ জন্য কম দায়ী মনে করে না। তবু কোথায় যেন এক আশ্চর্য নাড়ীর টান থেকে গেছে এই প্রাসাদের ইট কাঠে। সে ইচ্ছে করলে পার্টি করতে পারে—জনসভায় বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষণ দিতে পারে, এমন কী পার্টির তরফ থেকে পথ-নাটিকায়ও অংশ নিতে পারে—তবু বের হয়ে কোনো উদ্বাস্তু যুবকের সঙ্গে সে হাত ধরে হেঁটে যেতে পারে না। অদৃশ্য নিষেধ আঁকিবুকি আঁকা ছবির মতো ফুটে ওঠে দেয়ালে।

আসলে সে ভাল নেই।

বাবাকে বিলাসপুরে ট্রাঙ্ককল করা হয়েছিল। দাদু কী বলেছেন, সে জানে না। মেসোমশাইকে কী অভিযোগ করেছেন তাও সে জানে না। বাবা মা ভাই বোনেরা চলে এসেছে।

কেন যে কালীবাড়িতে নতুন মাস্টারকে দেখতে গিয়ে এই ফ্যাসাদ। দেখা না হলে, কিংবা লক্ষ্মী যদি তাদের নতুন মাস্টারের ভীতু স্বভাবের কথা না বলত, তবে কে বিলু, কে পিলু কিংবা 'অপরূপা' কাগজ নিয়ে তার মাথা ব্যথা থাকত না। বিলুর মধ্যে কবিতার আগুন—এ-সব কত কিছু ছাইপাঁশ তার যে মনে আসছে—সে এ-সব ভেবেই আজকাল বিষণ্ণ হয়ে যায়। তার কিছু ভাল লাগে না।

দাদু তার স্বাধীনতায় কখনও হস্তক্ষেপ করেন না। সে যে-ভাবে বাঁচতে

চায়, বাঁচতে পারে—এত দিন এমনই মনে হত। কিন্তু দাদুর অসুস্থতা তাকে ভাবিয়ে তুলেছে।—এ ছাড়া বিলুকে এ-ভাবে আগুনের মধ্যে সেই যেন ইচ্ছে করে ফেলে দিয়েছে। বিলুর রেলের চাকরি এক দণ্ডে বানচাল করে দিল। মাত্র ক'দিনের ছলনাতেই দাদু কাবু হয়ে গেছিলেন। সে বুঝেছিল, দাদু তাকে বিশ্বাস করেছে। সেজেগুজে পরেশ চন্দ্রের সঙ্গে বের হয়ে সে যে অভিনয় করেছিল, দাদু বিশ্বাসই করতে পারতেন না। বিলুও বিশ্বাস করতে পারল না, তার চাকরিটা ভণ্ডুল করে দিতে হলে এ-ছাড়া তার অন্য উপায়ও ছিল না।

বিলুকে দেশ ছাড়া করায় দাদুর এই চক্রান্ত মাথা পেতে নিতে পারেনি। একজন তার অভিনয়ে ঠকেছে।

অন্য জন তাকে বিশ্বাস করে ঠকেছে। ভেবেছে, আসলে সে পরেশের। তার মতো গরীব বাবার পুত্রের পক্ষে দুর্লভ।

বাড়ির সামনে বাগান। বাহারি সব বিদেশী ফুলের গাছ—সাদা কাকাতুয়া দাঁড়ে টাঙানো। ছবির মতো সব কিছু। সকাল হবার মুখে। আকাশ পরিষ্কার। কিছু নক্ষত্র চোখে পড়ছে। বাগানের এক কোনায় বড় একটা শেফালি গাছ—নিচে সাদা ফুল সারা রাত ধরে ঝরেছে।

শরতের ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে। কী আকাশে, কী লতাপাতায় কিংবা গাছপালার মধ্যে। এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও ঋতুটির বোধ হয় বৈরাগ্য আছে—যে জন্য মিমি বিশাল কাঠের কারুকাজ করা চামড়ার নরম গদিতে মাথা এলিয়ে দিতে পেরেছে। দাদু তাকে ডেকেছিলেন, পিসি ছোটকাকা ছিলেন পাশে। ন' কাকীমা, ছোট কাকীমাও তাকে বুঝিয়েছেন। মাথা গরম করিস না মিমি। বাবা তোর কাছে কথা চাইছে। তুই কথা দে।

তার বাবা মা ঘৃণায় তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেননি।

মিমি জানে কথা দিলেই, দাদু এ-যাত্রায় হয়তো ভাল হয়ে উঠবেন। এ বয়সে কতটা মানসিক উদ্বেগ থেকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন সে বোঝে। যেন বিলু বাড়ির ঐতিহ্যের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে!

সে ন' কাকীমাকে বলেছিল, কেন যে তোমাদের ছেলেমানুষী বুঝি না! এখনই কী বিয়ে করব। পড়াশোনা শেষ করতে দাও।

—পড়াশোনার বন্ধের কথা উঠছে কেন বুঝি না। অবুঝ হবে না।

দেখছ তো বাড়িটার কী হাল হয়েছে!

দাদুর যদি কিছু হয়!

কিছু হলে সবাই তাকে দায়ী করবে।

এই শরীর এত মহার্ঘ—তার রূপ আছে এবং সে জানে হেঁটে গেলে, সব মানুষ যেন চঞ্চল হয়ে পড়ে। সে তার লাল রঙের সাইকেলে চক্কর মারার সময়ও টের পায়—মানুষ জন তাকে দেখছে। শহরের সর্বত্র তার অবাধ যাতায়াত। রোজ একবার সকালে কিংবা বিকেলে সে পার্টি অফিসে গিয়ে বসবেই—নানা বর্ণের পোস্টার সে লিখতে ভালবাসে। ছবি আঁকতে ভালবাসে। মানুষের শক্ত হাত মুষ্টিবদ্ধ উপরে তোলা—সে যা স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে এই সব ছবিতে তা সে ধরে রাখতে চায়।

অথচ বিলুটা কী যে ছেলেমানুষী করে বসল। সে জানে বিলুর আর কিছুদিন পাত্তা পাওয়া যাবে না। চোরের মতো তাকে এড়িয়ে চলবে। দেখা হয়ে গেলে কথাও বলবে না। তাকেই গিয়ে বলতে হবে, কই এ সংখ্যায় তোমার কবিতা নেই কেন। কিংবা বিলুকে স্বাভাবিক করে তোলার দায়ও তার।

অথচ পরেশ চন্দ্র তাকে ছাড়বে না। হবু কবি তিনিও একজন। সে জানে কবিতা লেখার এই অপচেষ্টা সে কাগজের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলেই। পরেশ চন্দ্র যেন তার দাসানুদাস। সে কেন যে তাকে ঠিক একজন পুরুষের মতো ভাবতে পারে না। বিলুর তেজ কিংবা অহঙ্কারের ছিটেফোঁটা তার মধ্যে নেই। ইস যদি সামান্য বিলুর স্বভাব পেত তবে তার পক্ষে কথা দেওয়া বোধ হয় কষ্ট হত না। কিছুটা বেলেল্লাপনাই মনে হয় অথবা একটা অভুক্ত কুকুরের মতো তার পেছনে লেগে আছে। ভাবলেই কেন যে ওক উঠে আসে।

সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানেরা একটু বেশি বোধ হয় গো-বেচারা হয়ে থাকে। পরেশ চন্দ্রের যো হুকুমের তালিকায় নাম উঠে যেতেই সে তার প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ বোধ করে না।

সে যে কী করে!

সাময়িক দুর্বলতা হতে পারে—তবে এ-মুহূর্তে তার কাছে এটাই বড় সত্য। বিলু যা স্বভাবের তাকে নিয়ে কতদূর যাওয়া যাবে সে এখনও ঠিক

জানে না। আজ আবার তাকে ডাকা হবে সে জানে। আজ বোধ হয়, বাবাও থাকবেন। সে তার বাবাকে সমীহ করে। বাবাকে এড়িয়ে চলারও স্বভাব গড়ে উঠেছে সেই শৈশব থেকে। বাড়িতে তার কাকা কাকীমারাই বেশি আপন। মাকে সে নিজের কেউ ভাবতেই পারে না। দেখলেও মনে হবে না মা-মেয়েতে কোনো সম্পর্ক আছে।

এটা কী কোনো প্রতিক্রিয়া কিংবা অভিমান থেকে! তার পিঠাপিঠি ভাই বোনেরা যেন মা-বাবার কাছ থেকে তাকে অবাঞ্ছিত করে রেখেছে। শৈশবের কোনো অদৃশ্য অনাগ্রহ তাকে এ-ভাবে কী শেষে বাইরে টেনে নিয়ে গেল! এ-সব কী কোনো ক্ষোভ থেকে মনে হয়। কিংবা সে এ-পরিবারে দাদু ছাড়া আর কাউকে কী সে-ভাবে ভালবাসে না!

সে তার মধ্যে এতদিন ধরে আশ্চর্য এক তাজা প্রাণের সাড়া পেত। সে এক দণ্ড তার ঘরে বসে থাকতে পারত না। সে গড়ে উঠছিল নিজের মতো। ঝড় উঠে গেল কখন সে নিজেও যেন জানে না।

সে তো রওনা হয়েছিল অনুকূল বাতাসে। এমন দুর্বিপাকে তাকে পড়ে যেতে হবে কে জানত।

বাবার হুকুম হয়ে গেছে, বাড়ির বার হবে না।

হুকুম, মিটিং মিছিল বন্ধ।

হুকুম, পরিবারের মান সম্মান নষ্ট করার কোনো অধিকার তোমার নেই।

হুকুম, যদি মনে কর পরিবারের চেয়ে তোমার ইচ্ছের দাম বেশি তবে সম্পর্ক ত্যাগ করতে পার। আমরা কিছু বলব না।

তখনই এত কেন বুকে হাহাকার বাজে।

জন্ম জন্মান্তরের এক অনড় প্রস্তরের নিচে তাকে যেন পিষে ফেলার ষড়যন্ত্র হচ্ছে।

সে আগের মতো আর কী নেই! তার মধ্যেও কেমন এক অর্থহীন জীবন—বেঁচে থাকা গড্ডালিকা প্রবাহে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। সুধীনদা ফোন করলে বলেছে, যা ভাল বোঝো কর।

সুধীনদার প্রশ্ন, তোর শরীর ভাল নেই।

—কেন বলত!

—কেমন ধরা গলায় কথা বলছিস!

সে কী কথা বললেই ধরা পড়ে যায়। সবাই কী তবে রহস্য টের পেয়ে গেছে। বিলু যে বাড়ি বয়ে এসে তাকে অপমান করে গেছে, সবাই কী জেনে গেছে! জানতেই পারে। পিলুর যা স্বভাব, সে তো বিলুর বন্ধুদের বাড়ি চেনে। সে বলতেও পারে সব। তবে তাকে কেউ বিলু সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করেনি। বিলুর সঙ্গে কী হয়েছে জানতে চায়নি!

সে কেন যে হু হু করে কেঁদে ফেলল। আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে দিয়েছে। সকালের রদ্দুর বারান্দায়, কেউ দেখলে ভাবতেই পারে মিমি আঁচলে মুখ আড়াল করে ঘুমিয়ে আছে হয়তো। তখনই যেন কে বারান্দায় ঢুকে বলল, তোমার চা মিমিদি।

মিমি সে অবস্থাতেই বলল, রেখে যাও।

সে জানে মোহনদা চা রেখে চলে যাবে। এদিকের বারান্দাটা তার একান্ত নিজস্ব। তার ঘরের লাগোয়া। তার ঘরের দরজা দিয়েই এই বিশাল বারান্দায় ঢুকতে হয়। ঘরটা সে নিজের পছন্দমতো বেছে নিয়েছে। ঠিক অন্দরেও না, আবার সদরেও না। নিচের তলাটা একটা পুরো হলঘর। হলঘর পার হয়ে দাদুর বিশাল বসার ঘর। হলঘরে মাঝে মাঝে দাদুর সঙ্গে জেলার কংগ্রেস নেতাদের বৈঠক হয়। তখন সারা রাত্রি বাড়িটা গম গম করে। এঁরা সব মফস্বল শহর থেকে আসেন। কাঁদি, জিয়াগঞ্জ, জঙ্গিপুর, এমন কী আরও দূরবর্তী গ্রাম দেশ থেকেও। জেলা কমিটি গঠন নিয়ে, নির্বাচন নিয়ে কথা হয়। দাদুর পরামর্শমতো কোন অঞ্চল থেকে কে প্রার্থী হবে ঠিক করা হয়। যদিও কংগ্রেসের আলাদা অফিস আছে। হাজারদি ব্যাঙ্কের পুরো দোতলাটাই অফিস। নিজস্ব মুখপত্র আছে। তাতে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচীর সঙ্গে জেলার মানুষের অন্নকষ্টের কথাও থাকে।

আর তার ঘরে সামান্য একটা তক্তপোষ ছাড়া তেমন কিছু নেই। টেবিল চেয়ার আছে—র‍্যাক আছে। কিছু বই, কলেজের এবং মার্ক্স-এর উপর। লেনিনের ছবি ছাড়া ঘরে কোনো ছবিও টাঙানো নেই। দাদু বলতেন, সন্ন্যাসিনী দেখছি দিন দিন আরও বেশি গোঁড়া হয়ে উঠছেন। ঘরে আর সামান্য আসবাবপত্র রাখলে লেনিন সাহেব নিশ্চয়ই রাগ

করবেন না।

মিমি বলত, ঘরে একদম জঞ্জাল বাড়াবে না। বেশ আছে। তোমার ঘরে ঢুকে তো বলি না, এটা নেই কেন, ওটা নেই কেন। আমার চলে যায়।

দাদু প্রথম দিকে খুব রগড় করতেন—লেনিন সাহেবের যাদুটা কী বলত! তোমার মতো চৌকস রমণীকে হাত করে ফেলল। সারা জীবন এত পিছু পিছু ঘুরলাম, এ বুড়োটার ছবি দূরে থাক, তার কথাও দিনে—একবার মনে হয় না তোমার!

তার টাঙানো ফটো নিয়ে দাদুর পরিহাসে সে যোগ দিতে পারত না। কেবল বলত, ঠিক আছে যাও। আমার কাজ আছে। সে তার পাঠ্য বইয়ে নিমগ্ন হবার ভান করত। নোট নিত কাগজে। সে মেধাবী ছাত্রী, দাদুর এই এক অহঙ্কার আছে। রেজাল্ট বের হলে, দাদু হাঁ হয়ে যায়। এক কথা দাদুর—সারাদিন টো টো করে ঘরে বেড়াস পড়িস কখন! দারুণ রেজাল্ট দেখছি। কী যে বালকের মতো খুশিতে একে ওকে ফোন করা শুরু হয়ে যায় তখন।

সে আয়নায় দেখেছে ক'দিনেই চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে।

সে অবাক হয়ে ভাবে এত বড় অপমানই বা সে হজম করে গেল কী করে! বিলুর কী এ-ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না ক্ষোভ প্রকাশের। বাড়াবাড়ি করে ফেলল। তাহলে তুমি এই! ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি ঝলসে উঠল মিমির।

সে ভাবল—না, মোকাবেলা যখন করতেই হবে, তখন তাকে স্বাভাবিক থাকতে হবে। সে চা খেয়ে ডাকল, মোহনদা,আমার চানের জল দিতে বল।

তার নিজস্ব বাথরুমে এখনও জলের বন্দোবস্ত হয়নি। তার যাতে অসুবিধা না হয়, ইদানীং বাথরুমটা তার জন্য করা হয়েছে। তবে জলের লাইন এখনও আসেনি। ড্রামে জল ভর্তি থাকে। কুমুদ তার নিজস্ব কাজের মেয়ে। তবে কাচাকাচির কাজ সে নিজেই করে থাকে। নিচ থেকে জল টানতে কষ্ট হয় বলে কুমুদ করে দেয়। তার এটা খারাপ লাগে। অন্দরের বাথরুম এত দূরে যে সেখান থেকে জল টেনে আনার

চেয়ে নিচ থেকে জল টেনে আনা ঢের সুবিধা।

কুমুদকে এ-কাজটা করতে হচ্ছে তার অমতে। কোনো কারণে হাত পা খোঁড়া হলে, জল টানতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যেতেই পারে—দাদুর গোয়ার্তুমি—তুমি দিদি আমার কথা শুনছ না, এবং দাদু বোধ হয় যতটা দ্রুত সম্ভব করে দেবেন বলেই—কটা দিনের জন্য কুমুদ জল তুলে দিক এমন সম্মতি নিয়েছিল তাঁর কাছ থেকে।

দাদুর এক কথা, তোর এত জেদ কেন বলত দিদি! তুই কী আমাদের বৈভব সহ্য করতে পারিস না।

মিমি বলত, পচে গেছে সব। এ-ভাবে হয় না। বাড়ির ভিতরটা ছিমছাম, টবে গোলাপ গাছ,— আর রাস্তায় বের হলে মরা কুকুর বেড়ালের পচা গন্ধ—কাঁচা ড্রেনের গন্ধ খারাপ লাগে না দাদু তোমাদের!

—এ-জন্য কে দায়ী। আমি!

—এই সমাজ ব্যবস্থা।

দাদু কিঞ্চিত রূঢ় গলায় বলতেন, কোনো সমাজ ব্যবস্থাই আমাদের সহ্য হবে না। নিজেরা যতদিন না ঠিক হচ্ছি। আমরা কাজ করি না, কাজ করলে তার পেছনে লাগি। এমন আত্মকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা হাজার বছরের পরাধীনতার জের।

বড় বড় কথা বলে দাদুকে ক্ষেপিয়ে দিতে সে ভারি মজা পায়। পরে দাদু গট গট করে নেমে গেলে সে জানালার পাশে এসে ফিক করে হেসে ফেলে। বুড়ো সারাদিন সবার সঙ্গে মেজাজ নিয়ে কথা বলবে। দু-দিন হয়তো তার সঙ্গে কথাই বলবে না। স্রোতের বিরুদ্ধে সে গা ভাসিয়ে দিয়েছে বলে দাদুর কম অনুতাপ না—আবার মনে হয়, রক্তের তেজ মরে এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। দাদু হাসতে হাসতে বলবেন, এই যে গোমড়ামুখী, দ্যাখ কী সাজে সেজেছি!

দাদু তার বড় পরিপাটি স্বভাবের। সিল্ক না হয় মটকার পাঞ্জাবি, পাজামা পাটভাঙ্গা এবং কাঁধে চাদর—চিরদিন এই পোষাকেই দেখে এসেছে। মিহিখদ্দরের ধুতিও পরেন মাঝে মাঝে। জেলার কুটির শিল্পের সমজদার কত তিনি, পোষাকেই বুঝিয়ে দেন। কালীবাড়ির বাবাঠাকুর তাঁর জীবন্ত বিগ্রহ। দেয়াল জোড়া অয়েল পেন্টিং, বিলু বাবাঠাকুরের কাছে

একসময় মানুষ—এ-জন্য বিলুর অবাধ যাতায়াতে কোনো অসুবিধা হয়নি— তবে তার সঙ্গে বিলুর সম্পর্ক টের পেয়ে দাদুর চক্রান্তের কথা মনে হলে মাথা গরম হয়ে যায়। দাদুর উপর ঘৃণায় মুখ কুঁচকে যায়।

দাদু তুমি এত ছোট কাজ করতে পারলে!

বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে বিলুকে রেলে চাকরি দেবে বলেছ। তাকে দরখাস্ত করতে বলেছ। সার্টিফিকেটের নকল এটেটেস্ট করে দেবে বলে তাকে ঘুরিয়েছ। জানি চাকরিটা তার হতই—কিন্তু পরিণামের কথা ভাবলে না। সাদাসিদে ছেলেটাকে চাকরি দিয়ে বিদেয় করতে চেয়েছিলে। সে তোমাদের পরিবারে এত অবাঞ্ছিত! তোমরা মনে কর আমি কিছু বুঝি না। এবং এইসব চিন্তাভাবনাই তাকে কেন যে মাঝে মাঝে পরিবারের প্রতি তিক্ত করে তুলছে।

কুমুদ এসে বলল, মিমিদি, ভিতরে যান।

তার বুক ধড়াস করে উঠল। পরিবারের সবাই এক দিকে। কেউ তার পক্ষ নিয়ে কথা বলবে না। সবাই ভাবছে মাথা খারাপ। বিলুর সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলেই হল! কিন্তু তাই বলে বিয়েতে মত দিতে হবে—তার বিয়ে এত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সবার কাছে। তাও পরেশ চন্দ্র—মিমির শরীর কেমন শক্ত হয়ে গেল। সে ঝড়ের বেগে ঢুকে কী বলতে গিয়ে দেখল সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে—তাকে কী স্বাভাবিক দেখাচ্ছে না! তার পোষাক কী অবিন্যস্ত। সে নিজেকে দেখে চোখ ফেরাতেই অবাক—দাদুর ঘরে কাকে টেনে নিয়ে আসা হচ্ছে!

প্রায় হেঁচড়ে টেনে আনা হচ্ছে।

সে ছাড়া পেতে চাইছে। কেবল বলছে, আমি কী করেছি! আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন কেন! ইস লাগছে! তারপরই সে চিংকার করে উঠেছিল, মিমিদি, দেখ আমাকে কী করছে! আমাকে নাকি বেঁধে রাখা হবে। আমি ঢুকেছি কেন। না বলে কয়ে ঢুকে পড়েছি কেন!

মিমির চোখে আগুন জ্বলছে। সেদিনও বিলুর খবর নিতে এসে পিলু ভারি বিপদে পড়ে গেছিল। দাদা ফেরেনি, সকালে তার দাদুর সঙ্গে দেখা করে ফিরে যাবার কথা। ফেরেনি। মা বাবা চিন্তা করছে। সে কতদূর থেকে হেঁটে এসেছিল। আসতেই কুমুদ, মন্মথ, মোহনদারা ঝাঁপিয়ে

পড়েছিল। পরী ধীরে ধীরে নেমে গিয়ে বলেছিল, ছেড়ে দাও। ছাড় বলছি। সব চাকর বাকরেরা সোজা হয়ে গেছিল। সে পিলুকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছে। সরবত, মিষ্টি সাজিয়ে দিয়ে বলেছে, খা। তোর দাদা ফিরবে। ভাবিস না। পিলুটা কী মানুষ না, সেদিন এ-ভাবে জব্দ হবার পর আবার এসেছে! এরা তো তার দাদাকে নাগাল না পেয়ে ভাইটির উপর শোধ নিতে চাইছে। বাবার হুকুম জারি, আমার মেয়ের গায়ে হাত! আমি কখনও ক্ষমা করব! কুকুর দিয়ে খাওয়াব। চাবকাব। বাবা কেমন উন্মাদের মতো চিংকার করছিলেন। বড়বাবুর হুকুম তালিম করতেই এ-কাজ। কিন্তু পিলুর আসার এত কী জরুরী হয়ে পড়ল!

সে ছুটে গেল!

পিলুকে ছিনিয়ে নিয়ে আড়াল করে দাঁড়াল।

—একদম গায়ে হাত দেবে না।

পরিবারের সবাই থ। পরীর এই রুদ্রমূর্তি তারা যেন জীবনেও দেখেনি। দাদুর কাতর কথাবার্তা, কাকাদের কাতর অনুনয় কিছুই মিমির কানে যাচ্ছে না। সে ফুঁসছে। হঠাৎ সে উন্মাদের মতো চিংকার করে উঠল, রামবিলাস, রামবিলাস। তারপর নিজেই ঝড়ের বেগে করিডোর ধরে ছুটতে থাকলে, পিলু এক দণ্ড দেরি করল না। পরীদির পিছু পিছু সেও পালাতে গেলে মিমি কেমন হুঁস ফিরে পেল। সরল এক বালকের প্রভাবে পড়ে গেল। সে এটা কী করতে যাচ্ছিল! পিলুই যেন সম্বিত ফিরিয়ে এনেছে। —পরীদি এত ছুটছে কেন। পড়ে যাবে! পিলু জানে না, সে আজ এসপার ওসপার করতে চেয়েছিল। পিলুর জন্য পারল না।

পিলু দেখছে, মিমিদি হঠাৎ সিঁড়ির মুখে ধপাস করে বসে পড়ল। মিমিদি হাঁপাচ্ছে। সে পেছনে তাকিয়ে দেখল, বাড়ির লোকজন কিছুটা ছুটে এসে থেমে গেছে। এমন কী রায়বাহাদুর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। মনেই হচ্ছে না তিনি অসুস্থ।

সে ডাকল, এই পরীদি। ছুটছিলে কেন! কী হয়েছে। আমি চলে যাচ্ছি।

কারণ পিলুকে নিয়েই বাড়িতে বড় রকমের তাণ্ডব ঘটতে যাচ্ছিল। পরীদি যে-ভাবে ছুটে যাচ্ছিল, তাতে কিছু একটা করে বসাও বিচিত্র নয়।

তাকে হেনস্থা করতে দেখেই পরীদি আগুন হয়ে জ্বলছিল। আগুন নিভে গেলে যেমন চারপাশে ছাই পড়ে থাকে—কিংবা বিধ্বস্ত কোনো দৃশ্য—এ মুহূর্তে যেন বাড়িটার সেই চেহারা হয়েছে।

হঠাৎ পরীদি উঠে তার দিকে ছুটে এল। তারপর চুলের মুঠি ধরে পাগলের মতো ঝাঁকাতে থাকল, তুই এলি কেন মরতে। তোরা আমাকে আর কত অপমান করবি। বল, বল কেন এলি! লজ্জা হয় না, কীরে কথা বলছিস না কেন, লজ্জা হয় না, আবার যে এলি। তোকে সেদিন তাড়া করল, তবু তবু কেন এলি! কেন এলি! বলেই পিলুকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

মানুষের কী যে থাকে। পিলুর সঙ্গে যেন পরীর জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক। নিজের ভাই বোনদের প্রতি তার কোনো টান নেই। তারা ছুটি-ছাটায় এলে দিদিকে এড়িয়ে চলে। পিলু যে কখন সেই মায়া-মমতার জায়গা বেদখল করে ফেলেছে পরী বোধ হয় নিজেও জানত না। অথবা আজন্ম এই বৈভবের মধ্যে বাস করে, মানুষের অসহায় জীবন তাকে তাড়া করে থাকতে পারে। পিলু, বিলুর এক কালের প্রচণ্ড দারিদ্র্য হয়তো পরীকে টেনেছে।

সে যাই হোক, পিলু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, আমার কী দোষ! দাদাটা আবার কোথায় চলে গেছে। তোমাকে কী সব লিখে গেছে।

পরীদি যেন আর কাউকে পরোয়া করে না। সারা বাড়ির প্রতি কেমন ঘৃণায় মুখ চোখ শক্ত করে রেখেছে। পরীদি ইচ্ছে করলে যে সব করতে পারে তাও তার কেন জানি বিশ্বাস করতে কষ্ট হল না। তার দিকে অপলক তাকিয়ে বলছে, তোর দাদা কোথায় গেছে! বলে যায়নি!

—না। বলে গেলে ছুটে আসব কেন। এই দেখ না চিঠি।

পরীদি কাছে থাকলে সে আর কাউকে ডরায় না। অথচ আগে মনে আছে সে বাবার চাষ করা আনাজ শহরের বাজারে বেচতে এলে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকত। কী বিশাল বড় বড় থামওলা বাড়ি। কত বড় উঠোন। দোতালার জানালায় কাঠের কারুকাজ করা ঝালর। সব চেয়ে তার অবাক লাগত বাড়িটার শেষ মহলের পাশে কি বিশাল ফুল ফলের বাগিচা। একটা বিশাল সাদা পাখি দাঁড়ে ঝাপটাচ্ছে। সাদা রঙের

পাখিটাকে সে কতদিন অবাক হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখত। পরীদির মতো সুন্দর মেয়েটা এ-বাড়ির সে চিন্তাই করতে পারত না।

পরীদির মুখ কালো হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে বলল, আয় ভাই। কিছু মনে করিস না। আমার মাথা ঠিক নেই। তোর পরীদি মরে গেলে তোর কষ্ট হত ভেবেই, আর কিছু করতে সাহস পেলাম না। আসলে সে যে নিচের মহলে যাচ্ছিল, দাদুর চাবুকটা এনে সবাইকে এলোপাতাড়ি চাবকাতে চেয়েছিল—সব ভুলে গেছে। তার মধ্যে কী করে যে সহসা আত্মহননের ইচ্ছে জেগেছিল কেন এমন হয়, চাবুক আনতে যাচ্ছিল, না সিঁড়ি ধরে ছাদে উঠে যেতে চেয়েছিল—কিছুই মনে করতে পারছে না।

কে কী বলছে, কী দেখছে তার প্রতি পরীদির কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। কেমন কিছুটা জড়তায় ভুগছে পরীদি। পিলু চিঠিটা বের করতে গেলে বলল, আমার ঘরে চল। পরিবারের সবাই দেখছে মিমি পিলুকে নিয়ে তার ঘরে ঢুকে যাচ্ছে।

বিশাল করিডোর লম্বা, কতদূর যেন চলে গেছে! এতবার এসেও, নিচের ঠাকুর দালানের কোণটায় কী আছে জানে না পিলু। কিংবা নিচের ঘরগুলিতে কারা থাকে জানে না। কিছুটা পরিত্যক্ত বলেই মনে হয় ঘরগুলি। প্রায় সময় দেখেছে দরজা বন্ধ। জ্বালালি কবুতরের ওড়াউড়ি। কেউ একটা ঢিল পর্যন্ত মারতে সাহস পায় না। সকালে একবার এসে দেখেছিল, উঠোনে ছোলা মটর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কবুতরগুলো জড় হয়ে খাচ্ছে। মানুষজন পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও ভয় পাচ্ছে না।

মনে হয় কবুতরগুলো সব পোষা। সকালবেলায় দু'জন কাজের লোক বালতি বালতি জল এনে উঠোন বারান্দা ধুয়ে দিচ্ছে। কারণ হেগে মুতে সব নোংরা করে রাখার স্বভাব। এত জ্বালায়, তবু এ-সব কবুতর এ-বাড়ির কোনো শুভবার্তা বহন করে থাকে দেখলে এমনই মনে হয়। যেন এদের দেখভাল করার জন্যও বাড়িতে আলাদা কাজের লোক রাখা আছে।

পিলু অনুসরণ করছে।

সে কখনও বাড়ির এত ভিতরে ঢুকতে সাহস পায়নি। এক একটা ঘর পার হয়ে বারান্দা—লাল রঙের মেঝে, আয়নার মতো চক চক করছে। তার পায়ের ছাপ পড়ছে। ধুলো বালি মাখা পা। মুহূর্তে সারা বাড়িটা যেন

সে নোংরা করে ফেলেছে। তার নিজেরই সংকোচ হচ্ছিল। পরীদি ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে। বারান্দার শেষ মাথায় সবাই এখনও দাঁড়িয়ে আছে। যেন বাড়ির মিমি, মৃণ্ময়ী সত্যি তাদের কেউ হয় না। তার তো ভয় ভিতরে। বার বার পেছন ফিরে দেখছে আর গুটি গুটি এগুচ্ছে। পারলে এক লাফে সিঁড়ি ধরে নেমে পালাত।

নিচে সাইকেল। সাইকেলে উঠে বসলে কে আর নাগাল পায়। কিন্তু চিঠিটা সব মাটি করেছে। পরীদিকে চিঠিটা না দেখিয়ে গেলেও সে শান্তি পাচ্ছে না। তা-ছাড়া দৌড়ে পালাতে গেলেও পারবে না। এত মসৃণ মেঝে যে সে ভয়ে পা টিপে টিপে হাঁটছে। একটু অন্যমনস্ক হলেই যেন আছাড় খাবে—কিংবা পড়ে গিয়ে তার হাত পা ভাঙবে। সবাই তখন হা-হা করে হাসবে। কিন্তু পরীদি যখন ছুটে যাচ্ছিল সিঁড়ির দিকে তখন তো সেও ছুটে যাচ্ছিল দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে। বোধ হয় তখন সে নিজের মধ্যে ছিল না।

ঝাড় লণ্ঠনের রঙিন কাচ হাওয়ায় সামান্য দুলছিল। বিচিত্র বাহার ফুটে উঠছে।

সে পরীদির ঘরে ঢুকে যেতেই যেন মনে হল নিজের ঘর বাড়িতে ফিরে এসেছে। আর ভয় নেই। তার চালচলন আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে। চিঠিটি এবার পরীদিকে দিতে হয়। পরীদি নিজেই পড়ে দেখুক। কিন্তু আশ্চর্য, চিঠি সম্পর্কে পরীদির যেন কোনো কৌতূহলই নেই। ঘরে ঢুকে বলল, বোস। পালাবি না।

সে এ-ঘরটায় এসে বসলে আশ্চর্য এক মৃদু সৌরভ পায়। বকুল ফুলের মতো সুগন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াতে থাকে। হয়তো ঘরটার পিছনে কোনো বড় বকুল গাছ আছে। কিন্তু অসময়ে তো বকুল ফুল ফোটে না। কে জানে, কোথাও কোনো গাছে বারো মাস বকুল ফুল ফুটে থাকে কিনা। এদের কোনো কিছুর সঙ্গেই তাদের জীবনের মিল নেই। সাদা পাখিটার নামই জানত না। কাকাতুয়া দেখতে এ-রকমের হয় পরীদিদের বাড়ি আসার পর জানতে পেরেছে। টিয়া, ময়না কত তো পোষা পাখি আছে। কিন্তু এ-বাড়ির পক্ষে যেন কাকাতুয়া পাখি না থাকলে সম্ভ্রমে বাধে।

তাকে বসিয়ে রেখে পরীদি বারান্দার দিকে গেল কেন বুঝল না। কাকে

ডেকে কি বলল, ঘরের ভেতর থেকে সে তাও অনুমান করতে পারল না। সে একা তক্তপোষে বসে পা দোলাচ্ছে। আর তখনই দেখল, টানা-হেঁচড়াতে তার সার্টের হাতা ছিঁড়ে গেছে। কোথাও জ্বালা হচ্ছে। পিঠের দিকে, ছাল চামড়া উঠে গেছে এবং জ্বালা হচ্ছে পরীদির ঘরে ঢুকে বসতেই টের পেল।

দাদার জন্য তাকে যে কী-ভাবে হেনস্তা হতে হচ্ছে, কত যে ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে—শুধু তাকে কেন, বাড়ির সবাইকে—মা তো এখন দরজায় বিকাল হলেই চুপচাপ বসে থাকবে—বাবাও ভিতরে ভিতরে ভেঙে পড়বেন। পক্ষকালও পার হবে না। ছাতা বগলে শহরে চলে আসবেন। মুকুলদার বাড়ি বাবা চেনেন। ওদের পি ডব্লু ডি-র কোয়ার্টারের পাশে বড় কদমফুলের গাছ। যেন কোনো পরিব্রাজক অপেক্ষা করছে, মুকুলদা তো সেবারে দাদা নিখোঁজ হয়ে গেলে এমন ভাবেই বাবার নিখোঁজ সন্তানের অপেক্ষার কথা বর্ণনা করত।

একজন প্রবীণ মানুষ বসে আছে গাছতলায়।

ডাকলেও বাবা বাড়িতে ঢুকতেন না। তাঁর যা জামা কাপড় তাতে যেন যেখানে বসবেন সেখানেই ময়লা লেগে যাবে। বাবার এই সংকোচের কথাও মুকুলদা বলেছে দাদাকে।—তোমার কষ্ট হয় না বিলু, মেসোমশাই সকাল নেই বিকাল নেই, গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছেন দেখি। বৌদি কত করে বলেছেন, ভিতরে এসে বসুন। মুকুল বাড়ি নেই। আসবে।

বাবার এক কথা—ও ঠিক আছে। গাছের ছায়ায় বেশ ঠাণ্ডা।

ঘরে যে পাখা আছে বাবার বোধ হয় তাও জানা ছিল না। কিংবা তিনি তখন পুত্রের মুখ ছাড়া এবং গাছতলার ছায়া ছাড়া আর কিছুর মধ্যে বোধ হয় সান্ত্বনা পেতেন না।

মুকুলদা ফিরে এসে দেখলেই বলত, এ কি মেসোমশাই গাছের নিচে বসে আছেন। ভিতরে আসুন।

বাবার তখন এক প্রশ্ন, তোমাদের কাছে কোনো চিঠি দিয়েছে। মাস দুই তো হয়ে গেল। আমরা বেঁচে আছি না মরে গেছি তারও তো খোঁজ নিতে হয়।

মুকুলদা বলত, কী যে খারাপ লাগত বলতে, না মেসোমশাই বিলু

কোনো চিঠি দেয়নি। গ্যারেজের কাজে মন বসছে না আপনাকে বললেই পারত।

বাবার কাছে যেন এটা খুবই বিড়ম্বনার সামিল ছিল। বার বার খোঁজ নিতে এসে তিনি যেন মুকুলদাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিলেন।

কখনও বলতেন, আর বল না, ওর মা তো ঘরে এক দণ্ড শান্তিতে তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না। তাই বার বার আসি। কিছু মনে কর না।

মুকুলদা কত বুঝিয়েছে, চিঠি এলেই খবর দিয়ে আসব। আপনি ভাববেন না।

বাবা বোধ হয় মনে করতেন, তাঁর বার বার আসা মুকুলদার পছন্দ না। মুখ কাঁচুমাচু করে নাকি বলতেন, ও ঠিক আছে। তবে বাড়িতে বসে থাকি, পূজাআর্চায় মন বসছে না—কী করি, একটু হেঁটে এলে ভিতরের কষ্টটা দমন থাকে। খোঁজ নিতে আসি বলে কিছু ভেব না।

মুকুলদা তো একদিন ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে বলেছিল, তুমি মানুষ বিলু! এমন সরল সোজা মানুষটাকে কষ্ট দিতে তোমার খারাপ লাগত না। যেন সব দায় তার। দেশ ছেড়ে এসে এক দণ্ড বসে থাকেন না। আর তুমি গ্যারেজে বনিবনা হল না বলে পালালে। মেসোমশাই কী বুঝবেন, কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ। তোমার মানুকাকাই তো বলেছেন, যা নম্বর তাতে আর চাকরি জুটবে না। হাতের কাজ শিখুক—করে কম্মে খেতে পারবে।

তারপর মুকুলদা এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলেছিল, সব দোষ তোমার। বললেই পারতে, পড়ব, গ্যারেজে ক্লিনারের কাজ আমি করতে পারব না। তা না সবার উপর অভিমান করে নিরুদ্দেশ। আর বলি বাঙাল কাকে বলে—তুমি কী করে ভাবলে দেশের প্রধানমন্ত্রী তোমার অপেক্ষাতে বসে আছেন। দেশভাগের জন্য তোমাদের এই দশা, তাঁর এ জন্য দায়িত্ব রয়ে গেছে তোমার জীবনের সুবন্দোবস্ত করা—এ সব তোমার মাথায় আসে কী করে! বাঙাল কী আর সাধে বলে।

পিলু আমগাছের ডালে বসে সব শুনত। গাছের নিচে মাদুর বিছিয়ে দাদারা মজার মজার গল্প করত—তার দাদার বন্ধুরা শহরের মানুষ—আদব কায়দাই আলাদা। দাদার বন্ধুরা সাইকেলে দল বেঁধে এলে কী খুশি হন বাবা। বনজঙ্গলে বাস করা একজন উদ্বাস্তু মানুষের এত

সৌভাগ্য হবে বাবা যেন কল্পনাও করতে পারতেন না। ঘরের ভাল মন্দ, আমের দিনে আম, জাম জামরুল, যে দিনকার যা, খাঁটি দুধ এক গ্লাস করে—যেন বাবা তাঁর আর বাড়ি করার গৌরব এর মধ্যে টের পেতেন। সেই দাদাটা শেষে পরীদিকে মারল! বাবার অন্নপূর্ণাকে মারল!

অথচ পরীদির কোনো ক্ষোভ নেই।

যত ভাবছে অবাক হয়ে যাচ্ছে।

॥ চার ॥

পরীদি এল। শাড়ি সায়া পাল্টে পরীদি এল। সাদা সিল্ক, লাল ব্লাউজ, মুখে সামান্য প্রসাধন। সামনে এসে পরীদি পিলুর জামাটা দেখে বলল, ছিঁড়ে গেছে। দেখেছিস!

পিলু নিজের ছেঁড়া জামা আগেই দেখেছে। সে পরীদির কথায় আশ্চর্য হল না।

—কোথাও লাগেনি তো!

সে বলতে পারত, জ্বলছে। জামা তুলে দেখাতে পারত। সে জ্বালায় কষ্ট পাচ্ছে শুনলে পরীদিও কষ্ট পাবে। কিন্তু পরীদিকে এখন চিঠিটা দেখানো দরকার।

সে বলল, দাদা কাল রাতে কোথায় আবার চলে গেছে।

পরীদি খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, কখন গেল! দেখি চিঠিটা।

পিলু চিঠি এগিয়ে দিল, পরীদি পড়তে পড়তে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। পরীদি দাঁড়িয়েই আছে। এ-ঘরে সে বসে আছে পরীদির যেন খেয়াল নেই। চিঠিটা পরীদি উল্টে দেখল। কোথাও কী খুঁজল। তারপর বলল, আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি কে বলল!

—বাবা যে বললেন! তুমি বোসো পরীদি, দাঁড়িয়ে থাকলে কেন।

—বসছি। তুই খেয়ে নে। আমরা এক জায়গায় যাব। তুই সঙ্গে থাকবি।

পরীদির সঙ্গে যাবার তো কারো দরকার হয় না। সে দেখল, যারা তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, তাদেরই একজন সাদা পাথরের রেকাবিতে মিষ্টি

ফল সাজিয়ে এনেছে। পিলু যে কিছুটা পেটুক পরীদি জানে। কিন্তু এমন অসময়ে এত খাবার দেখে তার নিজেরই সংকোচ হচ্ছিল। বলল, পরীদি, আমার খিদে নেই।

—খা তো! লজ্জা হচ্ছে! দাদা তো লিখেছে আবার তিনি ফিরে আসবেন। আমাকে শহর ছেড়ে যেতে বারণ করে গেছেন। এত সাহস হয় কী করে তোর দাদার! আমি শহরে থাকব কী থাকব না আমার মর্জি। তোর দাদার কথায় থাকব।

পরীদিকে পিলু ঠিক বুঝতে পারে না। কেন এই ক্ষোভ—দাদা তো খারাপ কিছু লেখেনি। পরীদিকে দাদার জন্য বাইরে পাঠিয়ে দিতে হচ্ছে শুনে তারই খারাপ লেগেছিল। দাদার তো মন খারাপ হতেই পারে।

পরীদি চিঠিটা নিজের ব্যাগ খুলে রেখে দিতে গেলে পিলু বলল, চিঠিটা বাবাকে ফেরত দিতে হবে।

—চিঠিটা থাক আমার কাছে। তোর দাদার খুব আস্পর্ধা দেখছি। তিনি আমার জন্য সন্ন্যাস নিতে গেছেন। নিখোঁজ। নিখোঁজ হওয়া বের করব।

এই রে! পিলু ঘাবড়ে গেল পরীদির কথায়। ভেবেছিল, চিঠিটা পেলে পরীদি জলে পড়ে যাবে। ছটফট করবে, কোথায় গেল, কখন গেল, থানায় ডাইরি করা হয়েছে কি না, নিখোঁজ হলে নাকি থানায় যেতে হয়—কিন্তু এটা তো আর নিখোঁজ হওয়া নয়—লিখেই তো গেছে, আমার জন্য স্টেশনে গিয়ে বসে থাকিস না। আমি ফিরব।

পরীদির শরীরে মৃদু সৌরভ। আর পাটভাঙা সিল্কপরায়একটু নড়লেই খস খস শব্দ উঠছে। দু-একজন উঁকি দিয়ে তামাসা দেখার মতো তাকে দেখে গেল। পরীদি বোধ হয় সহ্য করতে পারছে না। ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তার দিকে তাকিয়ে বলল, এত লজ্জা তোদের কবে থেকে হল! এখনও কিছু মুখে দিলি না।

আসলে পরীদি যেন এবার তাদের সবার মর্যাদাকে খোঁটা দিয়ে কথা বলছে। 'এত লজ্জা তোদের' কথাটা তার ভাল লাগল না। পরীদি কী সব র‍্যাক থেকে টেনে নামাচ্ছে, কী যেন খুঁজছে। পরীদি যে ভাল নেই সে বোঝে। তবু এর মধ্যে পরীদি বাবাকেও যেন টেনে এনেছে।

পরীদি বইটই যা তক্তপোষে নামিয়ে রেখেছিল, তা আবার ভাঁজ করে র‍্যাকে সাজিয়ে রাখছে। দেয়ালে সেই লেনিনের ছবি—সে জানত পরীদির ঠাকুরদার বাবা কী তস্য পিতা কেউ হবে। সে কোনোদিন ছবিটা সম্পর্কে প্রশ্ন করেনি। আজ হঠাৎ কেন যে তার মনে হল, এমন সুন্দর মুখে পাগলের মতো দাড়ি কেন বুঝছে না। পরীদি যদি খুশি হয়, এইভাবেই যেন বলা, তোমার কে হয় ছবিটা। দাড়ি রেখেছে কেন! একটুখানি দাড়ি।

পরী কিছু একটা খুঁজে পাচ্ছে না। তা যে কী পরী নিজেও জানে না। অথচ খুঁজছে। সে পিলুর কথায় মুখ ফেরাল, কার কথা বলছিস?

পিলু আঙুল তুলে দেখালে বলল, আমার কেউ হয় না। চেষ্টা করছি আমি তার কেউ হতে পারি কি না। তোর দাদা ফিরে এলে জিজ্ঞেস করিস, পরীদির ঘরের ছবিটা কার! নে দয়া করে খেয়ে উদ্ধার কর।

—আমার খেতে ইচ্ছে করছে না বলছি।

—পিলু, আর কত জ্বালাবি। তোকে আমি জানি না মনে করিস। কালীবাড়িতে তোর দাদার কাছে গিয়ে বসে থাকতিস।

পিলু অবাক হয়ে গেল! পরীদি তবে তার পেটুক স্বভাবের কথা কালীবাড়ি থেকেই প্রথম জেনেছে। দাদা তখন কালীবাড়িতে থাকে—সেবাইত বদ্রিদার ছেলেদের পড়ায়। বাবাঠাকুরের কৃপাও পেয়েছিল দাদা। বাবাঠাকুর সেবাইত বদ্রিদার গুরুদেব। কালী মন্দিরেই তিনি থাকেন। নেংটি পরেন। বয়সের কোনো গাছ পাথর নেই। সারা দিন নিজের সঙ্গে কথা বলেন। কারো সঙ্গে কথা বলেন না। মাঝে মাঝে চটে গেলে, বাড়িসুদ্ধু সবাইকে বের করে দিতেন। ঝিলের জলে মাঘ মাসের শীতে নামিয়ে দিয়ে মজা দেখতেন—শুধু দাদা বাদ।

কালীর নামে মঙ্গলবার পাঁঠা পড়ে। মাংস ভাত—সুগন্ধ আতপ চালের ভাত দাদা, বাবাঠাকুর আর বদ্রিদা খেতেন। পরাত ভর্তি সন্দেশ। সে গেলেই বাবাঠাকুর মুঠো মুঠো সন্দেশ দিত খেতে। —তুই বিল্বর ভাই না! বিল্ব অর্থাৎ বাড়িতে যে উদ্বাস্তু তরুণ আশ্রয় নিয়েছে তার প্রতি যে কোনো কারণেই হোক বাবাঠাকুরের কৃপা ছিল সবার চেয়ে বেশি।

দাদা তাকে দেখলেই ক্ষেপে যেত।—আবার! যেন সে গেলে দাদার

এবং বাবার অপমান। একটু সুস্বাদু খাবার পাতে পড়বে এই ভেবে সে পালিয়ে এক ক্রোশ পথ হেঁটে দাদার কাছে চলে যেত। দাদার কাছে চলে যেত ঠিক—তবে আমবাগানে কিংবা বটতলায় লুকিয়ে থাকত। কিংবা দাদার দুই ছাত্র প্রায় তার সমবয়সী, তারা খোঁজখবর দিত মাস্টারমশাই কোথায়। পিলুকে ঠোঙা ভর্তি সন্দেশ এনে দিত। মাঝে মাঝে দেখতে পেত লক্ষ্মীদিকে। সে এখনও জানে না, আসলে, বাবাঠাকুর না লক্ষ্মীদি—সে গেলেই মিষ্টির ঠোঙা পাঠিয়ে দিত তাকে। জঙ্গলে বসে কিছুটা খেত। বাকিটা বাবাঠাকুর প্রসাদ পাঠিয়েছে বলে, বাবার হাতে এনে দিত। দাদা কখনও জানতে পারত না।

একবার টের পেয়ে দাদা তাকে রেল-লাইন পর্যন্ত তাড়া করেছিল—আবার যদি আসিস, আমি এখানে থাকব না বলে দিলাম। তুই কিরে, মান অপমানবোধ পর্যন্ত নেই। সবাই কী ভাবে! দাদার সেই তিরস্কার তাকে এতই পীড়নে ফেলে দিয়েছিল, যে আর কখনও যায়নি। কেবল মনে হত, তাকে দেখলেই দাদা কষ্ট পাবে। যেন সে গেলেই বদ্রিদার বাড়ির সবাই টের পেয়ে যায় তারা কত গরীব। লক্ষ্মীদি হয়তো সব বলে দিয়েছে পরীদিকে। পরীদির দাদু তো বাবাঠাকুরের নির্দেশ ছাড়া এক পা নড়েন না।

তারপর না খেলে পরীদি বুঝবে, তারও কম রাগ না। তাকে অপমান করেছে বলেই খাচ্ছে না। না খেলে কষ্ট পাবে। কেউ কষ্ট পেলে তার কেন যে এত খারাপ লাগে! তার খিদেও পেয়েছে। সে আর লোভ সামলাতে পারল না। একটা সন্দেশ তুলে মুখে আস্ত ঠেসে দিতেই প্রচণ্ড বিষম খেল। কাশছে।

—তুই কিরে, ইস, কী কাশছে! তাড়াতাড়ি মিমি জলের গ্লাসটা মুখের কাছে নিয়ে বলল, শিগগির জল খা। মাথায় চাপড় মারছে, ফুঁ দিচ্ছে। পিলুর চোখ লাল হয়ে যাচ্ছে। সে প্রচণ্ড অস্বস্তি বোধ করছে। আর পরীদি পাগলের মতো কী করবে না করবে ভেবে পাচ্ছে না। কেবল বলছে, এত বড় সন্দেশ এক সঙ্গে মুখে পুরে দিতে আছে! কড়াপাকের সন্দেশ। রাক্ষসের মতো গিলছিস!

পিলু দেখছে সারা ঘরে সন্দেশের অংশ বিশেষ ছড়িয়ে পড়েছে। ইস

কী বিষম খেল! দাদা হয়তো তার কথা ভাবছে। বিষম খেলে বাবা বলবেন, কে আবার তোমার কথা ভাবতে শুরু করল। জল খাও। কেউ কারো কথা ভাবলেই কিছু খেতে গেলে বিষম খেতে হয়। এটা সে বিশ্বাস করে। বিশেষ করে বাবার এমন সব আপ্তবাক্য শুনে শুনে তারা বড় হয়েছে যে, বিশ্বের সব কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণে। এই যে দাদা বের হয়ে গেল এটাও তাঁরই ইচ্ছে। কোনো শুভবোধ এর অন্তরালে কাজ করছে। এমন কী সে যে বিষম খেল, প্রায় চোখ উল্টে দিয়েছিল, এও তাঁর কোনো গূঢ় ইচ্ছে থেকে।

এবং অবাক হয়ে দেখল, পরীদি কেমন স্বাভাবিক গলায় বলছে, মেসোমশাইকে দাদু ডেকে পাঠিয়ে কী বলেছে, জানিস!

যাক পরীদির সেই রণংদেহী ভাবটা আর নেই। শান্ত স্বভাবের পরীদিকেই সে বেশি চেনে! তবে পরীদির রণংদেহী স্বরূপও তার চেনা। দাদার সঙ্গে কী নিয়ে যে খটাখটি লেগে থাকত বুঝতে পারত না।

—বিলু, তুমি মিলের ম্যানেজারের কবিতাটা অমনোনীত করলে? জান তিনি আমাদের একটা বিজ্ঞাপন দেবেন বলেছেন।

দাদা রেগে গিয়ে বলত, এই নাও সব। একদম আমার কাছে কিছু পাঠাবে না। ছাপাতে হয় তোমরা ছাপ। আমি এর মধ্যে নেই।

—আরে বুঝছ না কেন, দুশ টাকায় বিজ্ঞাপন।

—তাহলে বিজ্ঞাপনই ছাপ। কাগজ বের করে কী হবে!

—বিলু, তুমি এত অবুঝ কেন বুঝি না।

—আমি অবুঝ না তুমি! কে বল! এটা কবিতা হয়েছে। মিলের ম্যানেজার কী পদাধিকার বলে নিজেকে কবি ভাবছেন। বলে সুন্দর দামী প্যাডে লেখা কবিতার কাগজগুলি পরীদির মুখে ছুঁড়ে মেরে দিয়েছিল। পরীদি এতটুকু রাগ করেনি। কুড়িয়ে নিয়ে বলেছে, কী করে যে ফেরত দিই। আমি তার কবিতার এত প্রশংসা করে এলাম। বিজ্ঞাপনটা পাব বলেই করেছি। ঠিক আছে ফেরত দিয়ে দেব।

আবার সেই পরীদিই দাদার প্রাইমারি স্কুলের চাকরি নিয়ে কী না অশান্তি করেছে। তার হয়েছে মরণ। দাদাটা কখন কী করে বসবে কে জানে। দাদা সাইকেল নিয়ে হাঁটছে, পরীদিও তার লাল রঙের সাইকেল

নিয়ে হাঁটছে। বাদশাহী সড়কে উঠে দু-জনের মধ্যে হঠাৎ কী নিয়ে যে লেগে গেল।

সে ঝোপজঙ্গলের পাশ দিয়ে হাঁটছিল। কারণ পরীদি কেন এত আসে, গোপনে তাদের বাড়ি এসে মা-বাবার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়, যেতে চায় না, বাবার এক কথা, আর দেরি কর না, বিশ্ব কখন ফিরবে কিছু তো বলে যায়নি, এলে বলব তুমি এসেছিলে। পরীদির তখন কী উদ্বেগ। না মেসোমশাই ওকে কিছু বলতে যাবেন না। আমি আসি ও চায় না। পরে কোনো কারণে পরীদির কথা উঠলেই, দাদার মুখ কালো হয়ে যেত।—আবার এসেছিল! ও তো জানে আমি বাড়ি থাকব না। এসে বলতে পারল, বিশ্ব কোথায়! ও জানে না আমরা জিয়াগঞ্জে যাব। নদীর চরায় রাত কাটাবার কথা, তাও তো জানে! কী ধড়িবাজ মেয়েরে বাবা।

এ-সব কারণেই পিলুর কৌতূহল, দাদা এবং পরীদি যখন একসঙ্গে সাইকেল নিয়ে বাদশাহী সড়ক ধরে হেঁটে যায় তখন তাদের মধ্যে কী নিয়ে কথা হয়। দু-তিনবার সে পালিয়ে ঝোপজঙ্গলের ভিতর দিয়ে হেঁটে গেছে। কিংবা ওরা দু-জনে করাত কলের পাশে দাঁড়িয়ে নির্জনে যখন কথা বলত, তখনও জানার ইচ্ছে হয়, দুজন এত কী কথা বলে।

ওমা—কী বলছে পরীদি!

—বিলু, প্রাইমারি স্কুলে তোমার মাস্টারি সাজে না।

—কেন!

—না না। তুমি প্লিজ পড়া ছেড় না।

—তুমি কী আমার গার্জিয়ান! আমি কী করব না করব তুমি ঠিক করবে!

—বিলু, তুমি ছোট হয়ে যেও না। তুমি···তুমি আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না, অন্তত কলেজের পড়াটা আগে শেষ কর।

দাদার এক কথা, না।

—না? বলে পরীদি সাইকেলে চেপে বসেছিল। বলেছিল, আজ হোক কাল হোক তোমাকে আমার মরা মুখ দেখতে হবে। তোমার এত জেদ! আমাকে তুমি শিক্ষা দিচ্ছ!

—আমি তোমাকে চিনি না! হাড়ে হাড়ে চিনি।

পিলু গাছের আড়াল থেকে দেখেছিল, দাদার কোনো ভাবান্তর নেই। পরীদির সঙ্গে আর সাইকেলে গেল না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ। তারপর সাইকেলটা ঘুরিয়ে নিয়ে বালিরঘাটের দিকে রওনা হয়ে গেল।

সাদা পাঞ্জাবি সাদা পাজামা দাদার পরনে। ফিটফাট থাকার স্বভাব নয়। তবু মায়া দাদার মধ্যে কিছু একটা ঘটছে টের পেয়ে প্যান্ট জামা কেচে রাখে। ইস্তিরি করে রাখে। দাদার বন্ধুরা কতরকমের বাহারি পোষাক পরে আসে। তুলনায় দাদার কিছুই নেই—সেই দাদা যখন গাছপালার ছায়ায় চলে যায়—একদিকে পরীদি চলে গেল, অন্য দিকে দাদা—পরীদির চুল উড়ছে। পরীদির শাড়ির আঁচল উড়ছে—দাদার পাজামা পাঞ্জাবি পত পত করে উড়ছে—দৃশ্যটা তাকে কেন যে মাঝে মাঝে অন্য কথা বলে। এমন সুন্দর মেয়েটা মরে গেলে, দাদার কষ্ট হবে না!

আর কেন যে মনে হত পরীদি সত্যি বেহায়া। এমন বেপরোয়া জেদ জেনেও পরীদি কেন যে দাদার সঙ্গে মেশে! কোথায় এর কেন্দ্রবিন্দু সে টের পায় না। তার দাদা লম্বা—তার দাদার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, তার দাদার কথাবার্তা গম্ভীর, চাপা স্বভাবের। সেই দাদাটিকে নিয়েও তার কম আতঙ্ক নয়। দাদার মধ্যে কেমন একটা বড় বৃক্ষের ছায়া সে দেখতে পায়। যেন তার দাদা দু-হাতে সবাইকে আগলে রাখবে বলে ক্রমে গাছের মতো লম্বা হয়ে যাচ্ছে। ডালপালা মেলে দিচ্ছে। বনজঙ্গলে ঘর বাড়ির পক্ষে দাদা কতটা যে বেমানান পরীদির সঙ্গে হেঁটে যাবার সময়ও সে তা টের পায়। সেই দাদার এত জেদ, প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টার বড় কথা নয়, যেন দাদা একবার যদি জড়িয়ে যায় ইস্কুলটাতে তবে বের হবার পথ খুঁজে পাবে না। পরীদি তাই বোধহয় ত্রাসে পড়ে গেছে।

অবশ্য দাদা জানে, চাকরিটা কত দরকার। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের বোঝা বাবার ঘাড়ে। দাদা সেটা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে নিশ্চিন্ত করেছিল সবাইকে। কিন্তু পরীদির এক কথা, আর দুটো তো বছর। এতদিন যখন চলে গেছে, বাকি কটা দিনও চলে যাবে। দাদা মাথা পাতেনি। পরীদির মরা মুখ দেখতেও রাজি, কিন্তু চাকরি ছাড়তে রাজি নয়। সেই দাদাটা শেষ পর্যন্ত সব ছেড়ে ছুড়ে চলে গেল!

এত স্বার্থপর তুই দাদা!

বার বার কেন যে দাদার কথা ভাবলেই মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। দাদাকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। পরীদির দিকে তাকানো যাচ্ছে না। সে যাচ্ছে আর কত কিছু ভাবছে।

পরীদি তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সে কথা বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছে, তাড়াহুড়োর কিছু নেই। খেয়ে নে। না হলে আবার বিষম খাবি। আসলে সে পরীদির কথার জবাব দেবার জন্যই জল খেয়ে আর একটা সন্দেশ হজম করতে গেলে, পরীদির এই সতর্কতা।

তার প্লেট খালি হলে পরীদি ওটা হাত থেকে নিয়ে নিল। বলল, মুখ ধুবি আয়। বলে পরীদির বাথরুমে নিয়ে যেতেই সে বিস্ময়ে হতবাক। সুন্দর কারুকাজ করা পাথরে তৈরি কোনো মন্দিরের অভ্যন্তর যেন। বিশাল আয়না ফিট করা। সব কিছু এত ঝকঝকে যে সে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। বালতি থেকে পরী জল নিয়ে বলল, বেসিনে মুখ ধুয়ে নে। হাত পাত। আরে কী করছিস, জল নিচে পড়ছে দেখছিস না! বেসিনে জল ঢালার সময় বলল, জান বাবা না কী ক্ষেপে গেছে! বাবাকে তোমার দাদু বলেছে, শেষ বয়সে বাড়ি বয়ে অপমান। দাদার জন্য তোমাকে বিলাসপুরে পাঠিয়ে দিতে হচ্ছে। জান দাদা গুম মেরেছিল শুনে। বাবার হম্বিতম্বি দাদা জানত না। রাতে ফিরে এলে বললাম দাদাকে। সব শুনে দাদা কেমন গুম মেরে গেল।

—বাবার গোঁ জান তো।

—বাবা দাদাকে কুপুত্র বলেছেন।

—বাবা বলেছেন, এ যে মহাপাপ ধনবৌ। দেবীর গায়ে হাত! এ-পাপের যে ক্ষমা হয় না। আমাদের কী হবে! জান পরীদি, বাবাকে এমন জলে পড়ে যেতে দেখিনি। বাবা রাতে কিছু খানওনি। বলেছেন, দু-দিন নিরম্বু উপবাস। দু-দিন অহোরাত্র চণ্ডীপাঠ, যদি দেবী এতে শান্ত হন। দাদাও রাতে খেল না।

—মা এসে ডাকল। কত বোঝাল। বলল, তোর বাবাকে তো জানিস, গোঁ উঠলে তেনার বুদ্ধিভ্রংশ হয়। তুই খেয়ে নে।

—দাদা কেমন ভেঙ্গে পড়েছিল। সত্যি বলছি দাদাকে এ-ভাবে ভেঙ্গে পড়তে দেখিনি, বলল, বিশ্বাস কর মা, আমি পরীকে মারিনি। পরীকে মারতে পারি না। আর কেউ বিশ্বাস না করুক তুমি অন্তত বিশ্বাস কর, পরীকে আমি কখনই মারতে পারি না।

—তোর দাদা খেল!

—না খায়নি।

—মেসোমশাইও উপবাসে আছেন!

—তাই। সকালে দাদা নেই। এখন তো সবাই উদভ্রান্ত! কী যে হবে!

—সবাই তোরা কাল থেকে না খেয়ে আছিস!

পিলু চুপ করে থাকল।

পরীদি হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিল। জানালার পাশে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

সে বুঝতে পারছে না, পরীদি জানালায় তার দিকে পেছন ফিরে তাকিয়ে আছে কেন! তারপর পরীদি হঠাৎ ছুটে গেল বারান্দার দিকে। সে দাদাকে নিয়ে যেমন ত্রাসের মধ্যে আছে পরীদিকে নিয়েও কম ত্রাসের মধ্যে নেই। সেও উঠে বারান্দায় চলে গেল। পরীদি বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। সে এখন কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। কী যে করবে! আর তারপরই দেখল পরীদি চোখে মুখে জল দিয়ে বের হয়ে এসেছে। সাদা তোয়ালে কাঁধে ফেলা। মুখে সামান্য হাসি।

পিলুর গলা বুক শুকিয়ে গেছিল। পরীদিকে হাসতে দেখে সে যেন কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।

পরী বলল, চল। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

আশ্চর্য পরীদির সামান্য যে প্রসাধন ছিল মুখে এখন তাও নেই। তর তর করে সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নামতে থাকল। পেছন থেকে কে যেন বলল, কোথায় বের হচ্ছ!

পরীদি তাকাল সিঁড়ির উপরের দিকে। পরীদির বাবা দাঁড়িয়ে সিঁড়ির মুখে। সামনে থেকে চাকর বাকরেরা সরে দাঁড়িয়েছে।

পরীদি খানিকক্ষণ কিছু ভাবল। পিতা পুত্রীর এমন মুখোমুখী হওয়ার

দৃশ্য সে জীবনেও দেখেনি।

পরীদি শুধু বলল, তীর্থ করতে যাচ্ছি।

॥ পাঁচ ॥

পিলু মিমির গা ঘেঁসে রয়েছে। সিঁড়ি ধরে নামার সময়ও সে মিমির আড়ালে থাকছে। যেন একটু আলগা পেলেই খপ করে তাকে কেউ ধরে ফেলবে। আবার টেনে হিঁচড়ে উপরে তুলে নিয়ে গিয়ে কোনো পরিত্যক্ত ঘরে আটকে রাখবে। তেমন সুযোগ দিতে সে আর রাজি না। শত হলেও পরীদি তার একা। এত লোকজনের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন।

পরীদি সোজা নেমে হলঘরের কোনায় ফোনের কাছে চলে গেল। তাকে ইশারায় বসতে বলে, কাকে যেন চাইল।

—হ্যালো, হ্যাঁ আমি মিমি। সুহাসদা নেই?

ও-প্রান্ত থেকে কেউ কিছু বলছে। পিলুর খুব আগ্রহ ফোনে কান পাতার। সে শুনতে চায় দূর থেকে কীভাবে কথা ভেসে আসে। তার এই ফোনের খেলাটা একসময় মারাত্মক ছিল। দেশলাইয়ের বাকসে সুতো বেঁধে অপর প্রান্তে কাউকে কথা বলত। এ-জন্য একবার যা পিঠে পড়ে ছিল! এমনই নেশা যে নতুন দেশলাইয়ের খোল চুরি করে ধরা পড়ে যায়। সব কাঠি আছে। খোল নেই। মা পই পই করে বলেছে, পিলু তোর জন্য ঘরে দেখছি কিছু রাখার উপায় নেই! তোর কাজে লাগে না কী আছে বলত। দেশলাইয়ের একটা খোল রাখা যায় না। কিন্তু সেবারে আস্ত নতুন দেশলাইয়ের খোল নিয়ে হ্যালো হ্যালো বানাতেই মা বাড়ি এলে বিরাশি সিক্কার ওজনের কিছু কিল, এবং সে পিঠ বাঁকিয়ে দিয়েছিল, শ্বাস নিতে পারছিল না—আর পরীদি সত্যিকারের ফোনে কথা বলছে!

—সুহাসদা পার্টি অফিসে! ঠিক আছে।

মিমি আবার ফোন কেটে দাঁড়িয়ে থাকল। পার্টি অফিসে ফোন করতে হবে। সে ঘড়ি দেখল। আধ ঘণ্টা আগে বের হয়েছে। গোরাবাজার থেকে রাধারঘাট আসতে কতটা সময় লাগতে পারে আন্দাজ করল মনে মনে। আধ ঘণ্টা হয়ে গেছে বাড়ি থেকে বের হয়েছে। সোজা এলে আধ ঘণ্টার মধ্যে এসে যাবার কথা। আবার নাও আসতে পারে। পার্টির

ক্যাডারদের সামনে যদি পড়ে যায়—তবে এক টানা লেকচার শুরু করবে। তার তো কাজের শেষ নেই—কার হাসপাতালে বেড পাওয়া যাচ্ছে না, কার রেশন কার্ড হয়নি, কার স্কলারশিপের টাকা আসেনি, কে অকারণে বরখাস্ত হয়েছে, মিটিং মিছিল নিয়ে ব্যস্ত মানুষটা আধ ঘণ্টায় পার্টি অফিসে পৌঁছাতে নাও পারেন।

পিলু ঠিক বুঝতে পারছে না পরীদি কেন চুপচাপ ফোনের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কথা বলার যন্ত্রটাও নামানো। আর দোতলায় সিঁড়ির মুখে সবাই দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। কী গভীর নৈঃশব্দ।

যেন পরীদির আচরণে গোটা বাড়িটা স্তম্ভিত। কুকুরটা পর্যন্ত রা করছে না। পরীদিকে শুঁকছে। আসলে বাড়ির আগেকার সেই মেয়েটার সঙ্গে এ-মেয়েটার ঘ্রাণ এক আছে কি নেই শুঁকে হয়তো পরীক্ষা করছে।

পিলু এ-হেন দৃশ্যে খুবই বিচলিত। বাবার মুখের উপর কথা তারাও এক আধ সময়ে বলে ফেলে—কিন্তু এটা যে পরিবারের মর্যাদা নিয়ে টানাটানি, পিলুর মতো ছেলেও তা টের পায়। অথচ পরীদির কোনো ভাবান্তর নেই। এ-সময় সুহাসদাকেই আবার কেন ফোন। সেও চেনে, এক ডাকে সবাই চেনে মানুষটাকে। রোগা দুবলা, বেঁটে এবং ভারি কাচের চশমা চোখে। একটা সাইকেল তার নিত্য সঙ্গী। সাইকেলে চেপে বসলেই মানুষটার মধ্যে বোধহয় কোনো আগ্রহ সঞ্চার হয়। সে তাদের কলোনিতেও দেখেছে সুহাসদাকে। বাজারের দিকটায় একবার দেখেছিল। মিলের ইউনিয়ন নিয়ে কী সব কথাবার্তা বলছিল। সুহাসদার সঙ্গে সে দেখেছে সব সময় পাঁচ দশটা ছেলে থাকে। হাঁটলে তারা হাঁটে। থামলে তারা থামে।

—হ্যাঁ আমি। ভাবলাম পাব না। যাক শোনো, আমি কাটোয়া যাচ্ছি।

অপর প্রান্ত থেকে কথা ভেসে আসছে পিলু বুঝতে পারছে।

—আরে না। ও-সব কিছু না।

মিমি আবার থেমে বলল, না আমিই করব। কবে ঠিক হল।

—মিমি, তোমার যাওয়া বোধহয় ঠিক হবে না। এই যে সেদিন বললে, বাড়িতে তোমাকে নিয়ে অশান্তি চলছে। বের হওয়া বারণ। মুখার্জী সাবের সঙ্গে পাকা কথা বলার জন্য তোমার দাদু ওর বাবা মাকে

ডেকে পাঠিয়েছেন।

—তোমার সঙ্গে এত কথা বলার সময় নেই। আমিনার পার্ট আমিই করব। আমার কোনো অসুবিধা হবে না। আর শোনো আমার সুবিধা অসুবিধা নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। ছাড়ছি।

—কী বলছ! শোনো। আর একবার ভেবে দ্যাখ। ওখানে গিয়ে থাকা খাওয়ার অসুবিধা হবে। তা-ছাড়া...

—না না। আমি যাব।

—শোনো তুমি আমিনার পার্ট করতে পারছ না শুনে আমরাতো জলে পড়ে গেছিলাম। পরে ভাবলাম, লীনাকে দিয়েই ঠেকা কাজ চালিয়ে দেব। আমাদের জন্য অকারণ তুমি বাড়িতে অশান্তি সৃষ্টি কর না। মুখার্জী সাব তো দারুণ লোক।

—আচ্ছা আমি ছাড়ছি।

—তুমি কী বাড়ি থেকে করছ।

—হ্যাঁ।

—আমি যাচ্ছি।

—না। আমি এক্ষুনি বের হয়ে যাব।

—কাগজ। কাগজ চলছে।

—ছাড়ছি।

বলেই মিমি ফোন ছেড়ে বলল, এই পিলু, কী হাবার মতো তাকিয়ে আছিস। চল!

—আমি কথা বলব।

—কার সঙ্গে কথা বলবি।

পিলু এমন মুগ্ধ হয়ে গেছিল, যে সে নিজে কথা বলতে না পারলে, ফোনের রহস্যটা ঠিক জানতে পারবে না! তারপরই মনে হল, সত্যি সে কার সঙ্গে কথা বলবে! সে তো কাউকেই চেনে না। কিংবা অকারণ তো ফোনও করা যায় না। তার হ্যালো হ্যালো খেলাটা এখানে এসে এত বড় বিস্ময় হয়ে গেছিল, যে সে কেমন ঘোরে পড়ে গিয়েই কথাটা বলেছে।

মিমি কী ভাবল কে জানে! সে ফোন তুলে কাকে কী বলল, তারপর তার দিকে তাকিয়ে বলল, কর। সুহাসদার সঙ্গে কথা বল। তারপর

নিজেই বলল, সুহাসদা, পিলু তোমার সঙ্গে কথা বলবে। পিলুকে চেন না! বিশ্বর ছোট ভাই। যার কবিতার তারিফ করে বলেছিলে—ছেলেটার মধ্যে আগুন আছে।

পিলু শিশুর মতো আব্দার করে ফেলেছে টের পেতেই সে লজ্জায় পড়ে গেল। কিছুতেই ফোন ধরছে না। আর এত বড় প্রাসাদের মতো বাড়িতে এত উত্তেজনার মধ্যে মুহূর্তে সে যেন তার এবং পরীদির আগেকার জীবনের সন্ধান পেয়ে গেছিল। কিছুক্ষণ আগে তাকে টেনে হিঁচড়ে উপরে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল—জামা ছিঁড়ে গেছে, হাফ প্যান্টও খুলে গেছিল, এবং ধস্তাধস্তিতে তার পিঠের ছাল চামড়া উঠে গেছে—পিলুকে দেখলে এখন আর বিশ্বাসই করা যাবে না। সে কিছুতেই কথা বলবে না। পরীদির গা ঘেঁসে বলছে, না। তুমি ছেড়ে দাও।

মিমি হেসে ফোনে বলল, কথা বলবে না। লজ্জা করছে বাবুর।

—দাওনা ওকে।

—এই পিলু। ধর।

পিলু এবার বোধহয় সাহস পেয়ে গেছে।

মিমি বলল, সুহাসদা কথা বলবে। ধর বলছি। আরে উল্টো করে ধরলি কেন। না না, এদিকটা কানে রাখ। তুই আচ্ছা বুদ্ধু।

পিলু বোকার মতো ধরে আছে।

—বল হ্যালো।

পিলু ফোন ছেড়ে দিয়ে ছুটে পালাল। মরে গেলেও বলতে পারবে না। কেমন কৃত্রিম কথাবার্তা। হ্যালো বললেই সে যেন আর পিলু থাকবে না। সে তার বাবার দ্বিতীয় পুত্র—মাটির ঘরে বাস, ভাঙ্গা সাইকেলটা ধরলে পর্যন্ত দাদার তিরস্কার—আবার স্পোক ভেঙ্গে আনলি, তুই কী রে—তোর হাতে কিচ্ছু ঠিক থাকে না, আমার সাইকেল নিলি কেন—বলেই যে দাদার কানমলা খায়, তার পক্ষে হ্যালো বলা কত কঠিন, পিলুর ছুটে পালানো না দেখলে বোঝার উপায় নেই।

মিমি ফোন তুলে হেসে দিল। বলল, পালিয়েছে। লজ্জা পেয়েছে। তুমি বিকালে থাকছ তো। যদি পারি যাব। দিনক্ষণ ঠিক হলে জানিও। আমি মুক্ত। জান, আমার আর কোনো দ্বিধা নেই।

এবার পরী সিঁড়ির দিকে তাকাল। অবাক দাদু সোজা নেমে আসছে। সে জানে এ-বাড়িতে এই একটিমাত্র মানুষ তাকে যে কোনো কাজ থেকে নিরস্ত করতে পারে। দাদুকে নেমে আসতে দেখে অবাক শুধু না, কোথাও যেন এক সুপ্ত ছলনা সে টের পেল। দাদুর অসুস্থতা কী তবে ভান! কে জানে, যিনি গোপনে বিশ্বর সঙ্গে মেসোমশাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে রেলের চাকরির নামে একটা পরিবারকে ঠকাবার ষড়যন্ত্র করেছিলেন, সেই তিনি যে ভান করবেন না কে জানে! তবু দাদুর প্রতি তার টান আছে। সে দাদুকে নেমে আসতে দেখে বলল, আমি বের হচ্ছি। ভেব না। রোজই তো বের হই। এত উতলা হয়ে পড়ছ কেন। চল। ওঠো। অসুস্থ শরীরে কে তোমাকে নামতে বলেছে! ওঠো বলছি। বলে সিঁড়ি ধরে দাদুকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তর তর করে নেমে এল। সবাই তার আচরণে স্তম্ভিত। সে বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়। সোজা নেমে সাইকেল বের করে রাস্তায় নামতেই যেন সেই আগেকার মিমি। তার হাতে এখন কত কাজ!

পিলু তার পাশে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। টাউন হলের সামনে এসে মিমি বলল, সুধীনদাকে একটা ফোন করলে হত। ঠিক আছে চল। পরে ফোন করা যাবে।

আজ ছুটির দিন। রাস্তায় রিকসা, সাইকেলের ভিড় কম। তারা পুলিশ ব্যারাক পার হয়ে যাচ্ছে। বর্ষায় রাস্তায় খানা খন্দ। দু'জনই খানা খন্দ বাঁচিয়ে সাইকেল চালাচ্ছে।

একটা সুন্দর মতো বাংলো বাড়ির সামনে তারা থামল। আসলে পিলু জানে না, তাকে নিয়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছে। সামনে বিশাল স্কোয়ার মাঠ। বাঁ-দিকে, অফিস আদালত। আজ ছুটির দিন বলে সব ফাঁকা। এমন কী গাছতলাতেও প্রচণ্ড ভিড় দেখেছে পিলু—অফিস টাইমে রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাওয়াই কঠিন। গাছতলায় স্ট্যাম্প ভেণ্ডারদের আখড়া। তাদের ঘিরে কত লোকজন। কোর্ট কাছারি না থাকলে যা হয়—কেমন জনবিরল হয়ে আছে জায়গাটা।

তার মাথায় দাদার চিঠিটা নিয়ে দুশ্চিন্তা আছে। বাবা চান না, চিঠিটা আর কেউ দেখুক। পরীদি কেন যে চিঠিটা ব্যাগে রাখল!

সে সুযোগ বুঝে বলল, চিঠিটা সঙ্গে নিয়েছ তো। বাবা কিন্তু ফিরে

গেলেই চিঠির কথা বলবে।

—মেসোমশাই দেখেছে!

—দেখবে না! বাবাই যে চিঠিটা দিল। বলল, অযথা আর চিন্তা করবে না। তোমার খারাপ অভ্যাস—তোমাকে এ-জন্য বাবু চিঠি দিয়ে গেছেন।

—মেসোমশাই তোর দাদার চিঠি দিয়ে কী করবেন!

আর এ-সময় উর্দিপরা একটা লোক ছুটে আসছে। তারা যে গেটে দাঁড়িয়ে আছে কেউ নিশ্চয় ভিতর থেকে টের পেয়েছে। পাঁচিল এবং বাগান পার হয়ে বিশাল বারান্দা। বারান্দায় নীল রঙের বেতের চেয়ার টেবিল সাজানো। ধবধবে সাদা চাদরে ঢাকা। দূর থেকে সব কিছু এত পরিপাটি দেখেই পিলু বলল, কার বাসা এটা পরীদি! আর তখনই দেখল, আরে সেই লোকটা! তাদের বাড়ি একবার গেছিল—পরীদি পাঠিয়েছিল। বেঁটে মতো। সুন্দর ছিমছাম—লতাপাতা আঁকা আলখাল্লার মতো কী গায়ে। ডোর দিয়ে কোমরের কাছে বাঁধা। এটা খুবই বিচিত্র পোষাক—পরীদিকে দেখে উর্দি পরা লোকটার পেছনে ছুটে আসছে।

গেটের তালা তিনি নিজেই খুলে দিলেন। গেটের দরজা টেনে ধরলেন। পরীদি তার দিকে তাকিয়ে বলল, আয়।

আসলে মিমি বুঝিয়ে দিল ছেলেটি তার সঙ্গেই এসেছে। পরেশ চিনতেও পারে। কিন্তু না চেনার ভান করাতেই যেন বলা, আমার সঙ্গে এসেছে। বিশ্বর ভাই।

—আই সি। তোমাদের বাড়ি আমি গেছি।

মিমি এটাই চেয়েছিল। বিলুকে পরেশ আদৌ পাত্তা দিত না। কেবল কবিতা পাঠের আসরে বিলুবাবু বিলুবাবু করত। পরেশ এক দিন অবশ্য অভিযোগ করেছিল—বিলু শিষ্টাচার জানে না। হতে পারে। বিলু নাকি তার হাত থেকে পাণ্ডুলিপির বাণ্ডিল নিয়ে বলেছিল, ঠিক আছে। আমি পরীর সঙ্গে কথা বলে নেব। তাকে বাড়িতে নিয়ে বসায়নি—রাস্তা থেকেই বিদায় করেছে। পরেশ হাসতে হাসতে বলেছিল, দেখছি খুবই রাগী ছোকরা। আমার হাত দিয়ে পাঠানো উচিত হয়নি তোমার।

—তুমি গাড়িতে ওদিকে যাচ্ছিলে বলে দিয়েছি। ভেবেছিলাম, আমি নিজেই দিয়ে আসব। তোমাকে যেমন পছন্দ করে না, আমাকেও না।

দেখলেই ক্ষেপে যায় :

—খুবই দাম্ভিক।

—তা ঠিক।

আসলে পরেশের সঙ্গে বিলুর বয়সের তফাৎ অন্তত সাত আট বছরের। বিলু তার সঙ্গে পড়ে, আর পরেশ এখানে বছর দুই হল আই এ এস ক্যাডার থেকে এসেছে। পরেশের চালচলনে কিছুটা তেজি ভাব থাকলেও কবিতা পাগল। নিজে ছাইপাঁশ যাই লেখে, মনে করে তুখোড় কবি। কলকাতার বড় বড় কাগজে তার দু একটা কবিতা এক সময় ছাপা হয়েছে—তখন বোধ হয় পরেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। খুবই দুর্বল—অন্তত সুধীনদা মুকুলের মতে। বিলু ওর দু-একটা কবিতা পড়ার পরই কেন যে আর তার লেখা কবিতা ভুলেও দেখে না।—ও সাহেবের কবিতা। মুকুলকে দিও। আমার কাছে দেওয়া ঠিক হবে না। হারিয়ে ফেলতে পারি।

কবিতা পাঠের আসর হয়,পরেশ চন্দ্র তার বাংলোয় মাসে দু-মাসে কবিতা পাঠের আসর বসায়। সারা ঘরে সুগন্ধ ধূপ জ্বলে। রজনীগন্ধার স্টিক থাকে। তামার কারুকাজ করা ফুলদানিতে নীল রঙের কার্পেটের উপর সাদা ফরাস পাতা। বিশাল হলঘরটা কবিতা পাঠের আসরের পক্ষে খুবই উপযুক্ত জায়গা।

মিমি টের পেল পিলু খুবই অস্বস্তিতে পড়ে গেছে। তার পায়ে জুতো নেই। ইজের পরনে। সার্টও ময়লা। চুল কিছুটা ধূসর। সে কী ভেবে যে বলল, পরীদি, আমি যাই।

মিমি বলল, যাবি। একসঙ্গে যাব।

মিমি যাওয়ায় সাহেব বেশ বিহ্বল হয়ে উঠেছেন। হাতে তার একটা ভারি বই। যেন তিনি বইটা পড়ছিলেন, পড়তে পড়তে টের পেয়েছেন, তার প্রিয়জন গেটে এসে দাঁড়িয়ে আছে। অসময়ে গেটে তালা দেওয়া থাকে। অসময়ে পরী আসেও না। একা তো নয়ই। সঙ্গে কেউ না কেউ থাকে।

ঘরে ঢুকেই বলল, পরেশবাবু, তোমাকে একটু কষ্ট করতে হবে। হাতে ওটা কী বই। এত ভারি বই বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ কেন! কষ্ট হচ্ছে না!

পরেশ বলল, জেমস ফ্রজারের 'গোল্ডেন বাউ'। দারুণ। দারুণ। তুমি তো পার্টি কর, তোমার অবশ্যই পড়া দরকার। দেখবে নাকি! বলে পরেশ বই-এর পাতা ওল্টাতে থাকল।

মিমি বসে পড়েছে। দেখলে মনে হবে খুবই যেন ক্লান্ত। চুল অবিন্যস্ত হাওয়ায়। কপাল থেকে চুল সরিয়ে নিজেই উঠে গিয়ে পাখার স্পিড বাড়িয়ে দিল। আর তখনই দেখল পিলু বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে ঢুকতে ইতস্তত করছে। মিমি জানে, পিলু ধুলো পায়ে এমন সুন্দর কার্পেটের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া যায় কি না জানে না। সে হাত তুলে বলল, আরে তুই বাইরে কেন! ভিতরে আয়। কিচ্ছু হবে না। আয়।

পিলু সাহস পেয়ে সে তার পরীদির চেয়ারের পাশে ছুটে গিয়ে বসে পড়ল।

মিমি বলল, পরেশ, তোমাকে এক্ষুনি কয়েক জায়গায় ফোন করতে হবে। খবর নিতে হবে। ভেবে দেখলাম তুমি পার। থানা হাসপাতাল সব জায়গায় ফোন করে দেখবে। কোনো দুর্ঘটনার খবর আছে কিনা!

পরেশ কপাল কুঁচকে বলল, হোয়াট হ্যাপন্ড!

—আর বল না, বিল্ব কাউকে না বলে না কয়ে কোথায় চলে গেছে!

—ডিডন্ট হি টক টু এনিওয়ান বিফোর হি লেফট দ্য হাউস?

—না না, তাহলে তোমার কাছে আসব কেন। কাউকে কিছু বলে যায়নি।

পিলু তাড়াতাড়ি সংশোধন করে দিতে গিয়ে ধমক খেল মিমির।

পিলু বলতে চেয়েছিল, সে বলে যায়নি, তবে!

—তবে কী হতভাগা! আসলে মিমি জানে পিলু ভারি সরল স্বভাবের ছেলে। সে চিঠির কথা বলে দিতে পারে। দাদা তার জন্য চিঠি রেখে গেছে। হাবাটা বোঝেও না, চিঠিতে যা তার দাদা লিখে গেছে তাতে কোনো মেয়ের কপাল পুড়তে পারে। সে পরী মিমি কিংবা মৃণ্ময়ী বলেই হয়তো কোনো আঁচ লাগবে না। কিন্তু এ-নিয়ে ঢাক পেটানো ঠিক নয়, পিলুর বোধহয় তা জানা নেই।

পিলু থতমত খেয়ে থেমে গেল।

পরেশ বলল, তবে কী…!

—আরে ওর কথা কী শুনছ!

পরেশ আর কোনো কথা বলতেই যেন সাহস পেল না। মিমি জানে তার আগুনে পুড়ছে লোকটা। নিজেই আগ বাড়িয়ে তার বাবাকে দিয়ে প্রস্তাব দিয়েছে। এটা ঠিক সব দিক থেকেই পরেশ তার যোগ্য মানুষ—তবু কোথায় যে থেকে যায় নদীর পাড়ে মানুষের হেঁটে যাওয়ার ছবি। সেই ছবির কথা ভাবলেই জীবনের সব মূল্য কোনো শিউলিতলায় ঝরা ফুলের মতো বাসি হয়ে যায়।

পরেশ কাকে যেন ফোনে কী বলল। কোণায় গোল মতো ছোট্ট টেবিলের উপর বাহারি ফোন। ঝালরের ঢাকনা টেবিলে। এবং ঘরের মধ্যে বিলাসের উপকরণ। একজন বাঙালী সাহেব হতে গেলে যা যা দরকার কোনো কিছুর খামতি নেই। বিশাল কাচের আলমারি। থরে থরে কাচের দামি রকমারি গ্লাস সাজানো। পাশে পরেশের নিজস্ব ছোট্ট সেলার। পিলু হাঁ হয়ে দেখছে।

পরেশ ফোন করে দিয়ে এসে মিমির সামনে বসল। অসময়ে পরী কেন এসেছে বুঝতে পেরে সেই প্রসন্নতা আর নেই। কলোনির এক উদ্‌ভ্রান্ত রাগী ছোকরার জন্য তাকে ফোন করতে হচ্ছে ভেবে কিঞ্চিত বিরস মুখ। বলল, এখুনি খবর পাবে। কী খাবে বল!

—কিছু না। এক গ্লাস জল দাও। ঠাণ্ডা না। তুমি তো জান ঠাণ্ডা জল আমি খাই না। গলা ধরে যায়।

মিমি বুঝতে পারছে, পরেশ তার কোনো অধস্তন কর্মচারিকে দায় সঁপে দিয়েছে।

এখন শুধু ফোনের অপেক্ষা।

কখন কে রিঙ করবে।

পরেশ কী বলছে, কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছে না।

যেমন বলছে, গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান শুনলাম অসুস্থ।

যেমন বলছে, আজই যেতাম। কাজে আটকে গেলাম।

মিমি হুঁ হাঁ কিছু বলছে না। শাড়ির আঁচল টেনে দিচ্ছে। পরেশ তাকে দেখলে, আসলে কী দেখে জানে। পুরুষ মানুষের এই ব্যাধিগ্রস্ত চোখ সে সহ্য করতে পারে না। সে জানে না, এটা কেন হয়। নানা জায়গায় সে

ঘোরে। কম পুরুষই আছে তাকে দেখলে স্বাভাবিক থাকতে পারে। বিলুর সঙ্গে এত মিশেও, কেন যে তাকে সে বোঝে না। বিলুর মধ্যে সম্ভ্রমবোধ গভীর এটা সে টের পায়। যতই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করুক—সে জানে, বিলুর কাছে সে সর্বনাশ ছাড়া কিছু নয়।

বিলু তাকে নিয়ে গোপনে একটা কবিতাও লিখেছিল। এবং সেটা চুরি করেছে। তখন কবিতাটা এতখানি গুরুত্ব পায়নি। সেটাই সে আজ র‍্যাক থেকে বই নামিয়ে খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেছে। বিলুর কবিতায় ছিল, তার প্রতি বিদ্বেষ। অন্তত তখন তাই মনে হয়েছে। আজ কেন যে মনে হল, না, সে কবিতার ঠিক যেন অর্থ ধরতে পারেনি। নিরিবিলি কোনো জায়গায়, অথবা বিলুদের বাড়ি যাবার পথে কবিতাটা আর একবার দেখবে।

বিলু খাতার পাতা ছেঁড়া দেখে বাড়িতে প্রচণ্ড নাকি অশান্তি করেছিল।—কে ঢোকে আমার ঘরে। কার এত সাহস। সে মায়াকে ডেকে বলেছিল, খাতার পাতাটা কে ছিঁড়ে নিয়েছে জানিস!

মায়া বলেছে, না।

পিলুকে বলেছে। একই জবাব।

সে যে বিলুর অনুপস্থিতিতে তার বাড়িতে এত আপন—পিলু, মায়া, মেসোমশাই, মাসিমা ছাড়া কেউ জানে না। বিলুর ঘরে কিংবা যে কোনো ঘরে সে শুয়ে বসে থাকতে পারে। ঘুমিয়ে থাকতে পারে। বিলুর কবিতার খাতা হাতড়াতে পারে। নতুন কবিতা যা লিখল বিলু, এটা জানার তার এক অপরিসীম আগ্রহ। সে তা জানতে গিয়েই কবিতাটা আবিষ্কার করে ফেলেছিল। আর পড়ে সে বেশ মজা পেয়েছিল। জ্বালা ধরিয়ে দিতে পেরেছে—সে তো এটাই চায়। জ্বলুক। জ্বলে জ্বলে খাক হয়ে যাক। সে গোপনে খাতা থেকে পাতাটা ছিঁড়ে নিয়েছিল।

সে যে পরেশের সঙ্গে সেজেগুজে সিঁড়ি ধরে নামছিল, তাও সেই এক জ্বালা থেকে। বোঝো, জ্বালা কত গভীর। কেন এত লাগল! আমাকে দেখলে ক্ষেপে যাও আর পরেশের সঙ্গে দেখলে হৃৎপিণ্ড জ্বলে যায়! কেন! কেন এটা হয়! তুমি বিলু কী মনে কর! রেলের চাকরি, বিলাসপুরে নির্বাসন—এত সোজা! কত সহজে শিস দিতে জানি, কত

সহজে একজন পুরুষকে দিয়ে অভিনয়ে মেতে যেতে পারি, দাদু পর্যন্ত মজে গেল দেখে। সিঁড়ি ধরে নামছি। আগুনের মতো জ্বলছি। প্রসাধন কতটা করতে পারি ইচ্ছে করলে দেখে টের পেলে তো। তুমি কে, তোমাকে চিনিই না—অ বিলু—দাদুর সঙ্গে দেখা করবে। বোঝো। আমি তো জানতাম তুমি আসবে। সার্টিফিকেটের নকল সঙ্গে, দাদু নিজে সব করে দিচ্ছেন, রেলের চাকরি পেয়ে উদ্ধার হয়ে যাবে—বোঝো, এক পলকে সব ভণ্ডুল। তুমি সহ্য করতে পারলে না। আগুন জ্বলে উঠল মাথায়। পাগল হয়ে গেলে—তোমার পরীর পাখা গজিয়েছে। নেচে নেচে নামছে। উড়ছে। পতঙ্গ হয়ে তুমিও পুড়ে মরলে। তোমার মাথা কত সহজে বিগড়ে দিলাম—আমার কী ভয় বিলু জান না, যদি তুমি হেসে কথা বল, যদি আমার উগ্র প্রসাধন জ্বালা ধরাতে না পারত, পরেশের হাত ধরে নামতে নামতে দেখতাম—তুমি সরে দাঁড়িয়েছ, আমাদের পথ করে দিয়েছ, তবে হয়তো আমি নিজেই তোমার চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকিয়ে দিতাম। রামবিলাসকে বলতাম—একটা রাস্তার কুকুর বাড়িতে ঢুকল কী করে! তাড়াও। তাড়াও!

কিন্তু না, তুমি ক্ষিপ্ত হয়ে গেলে। নিজেকে সামলাতে পারলে না। চোখে আগুন জ্বলে উঠল। যা-হোক মাথাটা যে গোবর পোরা নয়, সেই আমার সান্ত্বনা। পরেশকে নিয়ে রঙ্গ করছি, তোমাকে বিদ্রূপ—টের পেলে। দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়লে! পারলে না। নিজেকে সামলে রাখতে পারলে না। নকল মিষ্টি হাসিতে তোমাকে কী বলতে গেলাম, আর ঠাস করে গালে চড় মারলে—অঃ বিলু এ যে আমার...

রিঙ বাজছে।

পরেশ ছুটে গিয়ে ফোন ধরল।

পিলু মিমি তাকিয়ে আছে।

মিমি অপেক্ষা করতে পারছে না। সেও ফোনের কাছে চলে গেল।

পরেশ ফোন নামিয়ে বলল, না কোনো দুর্ঘটনার খবর নেই। কুমারপুরে একজন খুন হয়েছে। আলম নাম। পারিবারিক কলহ।

মিমির যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

সে বলল, আমরা যাচ্ছি। পরে আসব।

পিলুটা যে কোথায় গেল! মায়া দেখল, বাবা বিড় বিড় করে বকছে। এই অসময়ে কেউ বাড়ি ছাড়া হলেই যেন দুশ্চিন্তা। মায়া রাস্তায় দৌড়ে গেল।

বাড়িঘরের পাশে কিছুটা জমি। তারপর রাস্তা। রাস্তাটা গেছে বড় সড়কে। সীমানা বরাবর সব আম জামের গাছ। বাবাই লাগিয়েছিলেন। এখন বাড়িটাকে ছায়া দিচ্ছে। বাড়িটা কোনো সম্পন্ন গেরস্থের বাড়ি মনে হয় আজকাল দূর থেকে। চৌচালা টিনের ছাউনি দেওয়া ঘর। মাটির দেয়াল। বড় ঘরে মা, বাবা, ভাই আর সে থাকে। বড় ঘরের সামনে উঠোন পার হয়ে পশ্চিমমুখী ঠাকুরঘর। দক্ষিণমুখী ঘরটায় দাদা, ছোড়দা থাকে। বাবা সম্প্রতি উত্তরমুখীও একটা ঘর তুলে জঙ্গল থেকে নবমী বুড়িকে তুলে এনেছেন। বড় ঘরের পাশে তুলসীমঞ্চ। ডালিম গাছ এবং সফেদা গাছ পার হয়ে গোয়াল ঘর। বাড়িটাতে লোকজন আসছে যাচ্ছে। দুঃসংবাদ পেয়ে সবাই আসছে। বাবা এতক্ষণ মাকে বোঝ-প্রবোধ দিচ্ছিলেন। কিছু ধর্মগ্রন্থ সম্বল। বারান্দায় বসে, বাবা মাকে বলছিলেন, ধনবৌ, আমরা সবাই নিমিত্ত মাত্র। দুশ্চিন্তা কর না। তাঁর স্মরণ নাও। তিনিই গতি, তিনিই কর্তা। তিনিই প্রভু—তিনিই সব কিছুর সাথী। আশ্রয় বলতেও তিনি। তিনি আমাদের শরণ সুহৃৎ। আবার তিনিই প্রলয়, তোমার আমার উৎপত্তির আধার। লয় কিংবা অবিনাশী বীজ স্বরূপ সেই অনন্ত জিজ্ঞাসার কাছে আমাদের মাথা নোয়ানো ছাড়া এখন আর কোনো উপায় নেই। বিচলিত হলে চলবে কেন! সবাই কাল থেকে উপবাসে আছি। রান্নার আয়োজন কর।

যেন বাবা মাকে সবার উপবাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সংসারে তার দায় সম্পর্কে সচেতন করে দিতে চাইলেন। পিলু কোথায় গেল আবার! আসব বলে বের হয়ে গেল, ফেরার নাম নেই। তারপরই বিড় বিড় করে কোনো মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন। বাবা নিজেকে অসহায় ভেবে ফেললে, কোন কবচ পাঠ করে থাকেন। এতে তাঁর মধ্যে সাহস সঞ্চয় হয়। সব দুর্গতির প্রতি কিঞ্চিত তিনি অবহেলা দেখাতে পারেন।

মায়া টের পেয়েছিল, ছোড়দা ফিরে না আসায় বাবার এই দুশ্চিন্তা। এখন যেন বাড়ি থেকে কারো বের হয়ে যাওয়া ঠিক না। ছোড়দাটাও বড় অবুঝ। দেখছিস বাড়িতে কী বিপত্তি—তার মধ্যে না বলে না কয়ে কোথায় চলে গেলি। আসছি বলে গেলি, এখনও ফেরার নাম নেই। মায়া রাস্তায় ছুটে গিয়ে দেখল, যদি দাদা ফিরে আসে। বড় সড়ক থেকে মাঠ ভাঙতে হয়। কিংবা নিমতলার দিকে যদি যায়। সে চারপাশে দাদাকে খোঁজার সময়ই দেখল—পরীদি আসছে। আর পরীদির পেছনে ছোড়দা সাইকেল চালিয়ে আসছে। ছোড়দা তবে পরীদিকেই খবর দিতে গেছিল।

সে দৌড়ে এসে বলল, বাবা, পরীদি আসছে।

খবরটাতে বাবা ভারি বিব্রতবোধ করলেন।

বাবা বললেন, পিলু ওর চিঠিটা যে কোথায় রেখে গেল। যেন তিনি ভাবলেন, পরী যদি এসে টের পেয়ে যায় তারই জন্য বিলু চলে গেছে, তবে আর এক কেলেঙ্কারি। মেয়েটাই বা কী ভাববে। এমন অপরিণামদর্শী পুত্র যে চিঠি পর্যন্ত রেখে গেছে। এত কথা লেখার কী দরকার ছিল। পরী তো এসেই বিলুর ঘরে ঢুকে যাবে। নিজের মধ্যে তিনি পুত্রের দায় নিয়ে কিছুটা বিচলিতই হয়ে পড়েছেন।

তাড়াতাড়ি বিলুর ঘরে ঢুকে গেলেন। চিঠিটা যদি এখানে সেখানে পিলু গুঁজে রাখে। আর পরী তো এসে সব খোঁজাখুঁজি করতেই পারে। কারণ বিলু কখন বাড়ি থাকবে না, কোথায় যাবে আগে থেকেই পরী জানতে পারে। সেই বিলু নিখোঁজ। কোনো চিঠিপত্র যদি রেখে যায়!

পরীদি আসছে শুনলে বাবা রাস্তা পর্যন্ত ছুটে যেতেন!

—পরী আসছে! কোথায়। রাস্তায় গিয়ে বলতেন, মা অন্নপূর্ণা আবার আজ গরীবের ঘরে এলেন!

বাবার এমন উক্তি একবার পিলু প্রকাশ করতেই বিলু চটে লাল।—মা অন্নপূর্ণা! তা হলেই হয়েছে!

সেই বাবা ঘর থেকে বের হচ্ছেন না। মায়া উঁকি দিয়ে দেখল, বাবা দাদার বই হাঁটকাচ্ছেন, ছোড়দার খাতা বই খুঁজছেন। এবং প্রচণ্ড ঘামছেন। দাদার তোষক তুলে দেখছেন। তক্তপোষের ধারে উঁকি দিয়ে খুঁজছেন। জানালার জাফরি আরও তুলে দিয়ে ঘরের অবস্থা লণ্ডভণ্ড করে ফেলছেন।

একপ্রস্থ ছোড়দা করে গেছে, শেষ প্রস্থ বাবা করছেন। মায়া ভাবছে সব তাকে গোছগাছ করতে হবে—রেগে কাঁই। পরীদি উঠোনে ঢুকেই বলল, এই মায়া, মাসিমা কোথায়।

—মা ঘরে শুয়ে আছে।

—মেসোমশাই।

—দাদার ঘরে।

মিমি পিলুকে বলল, সাইকেলটা রাখ ঘরে। সে শাড়ি গাছ কোমর করে বাঁধল—তারপর ছুটে দাদার ঘরে ঢুকে অবাক—মেসোমশাই ঘরের সব কিছু টেনে নামিয়েছেন। মুখে ঝুলকালি। ফতুয়ায় ঝুলকালি। ঘেমে নেয়ে গেছেন। বিধ্বস্ত সব কিছুর মধ্যে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন।

পরীর ঘরে ঢুকেই মনে হল পুত্রশোকে যেন পাগল মানুষটা। অন্তত দেখলে তাই মনে হয়। পরীর কথায় হুঁস ফিরতেই তিনি ফের তক্তপোষের নিচে ঢুকে কী সব টেনে আনতে থাকলেন।

—কী খুঁজছেন। আমাকে বলুন। কী অবস্থা করেছেন!

পরী দেখছে মেসোমশায়ের মাথাটাও ঝুলকালিতে লেপ্টে আছে। মাথায় ঘাস পাতার মতো কী সব জড়িয়ে আছে। আসলে আগে এই ঘরে পরী দেখেছে গরুর ঘাস কেটে রাখা হত। বিলুদের তখন দু'টো ঘর সম্বল। একটা মাটির দেয়ালের, আর বিলুর ঘরটায় পাটকাঠির বেড়া। চারপাশে আম জাম গাছ, লিচু গাছের কলম, পেঁপে গাছ কলা গাছ, যেমন প্রথম দিকে কলোনির ঘর বাড়ি হয়ে থাকে—সেই মেসোমশাই ধীরে ধীরে কীভাবে নিজের শেকড় বাকড় চালিয়ে দিলেন, বিলুটা বুঝল না। এত অবুঝ কখনও হলে চলে!

কিন্তু তিনি পরীকে দেখে আদৌ খুশি হননি।

—এই বুঝলে, পিলু এসেছে! কখন বের হয়ে গেল! ফেরার নাম নেই!

পরী মেসোমশায়ের কাঁচা-পাকা চুল থেকে আম পাতা তুলে বলছিল, পিলু ফিরেছে। কী খুঁজছেন বলুন না। আমি দেখছি। তারপরই ডাকল, এই পিলু, পিলু। শোনতো, মেসোমশাই কী খুঁজছেন দ্যাখতো। খুঁজে পাস কিনা দ্যাখতো।

পিলু ঘরে ঢুকে বাবার অবস্থা দেখে হতভম্ব। সে জানে বাবা কী খুঁজছেন! পরীদিকে বলল, দাদার চিঠিটা খুঁজছেন।

বাবা হঠাৎ রেগে গিয়ে বললেন, দাদার চিঠি দিয়ে কী তোমরা আমার আদ্যশ্রাদ্ধ করবে, যে সেটা ঠিক ঠাক আমাকে রেখে যেতে হবে!

পরী কখনও এই মানুষটিকে এত উতলা হতে দেখেনি। এমন কী রাগতেও দেখিনি। চিঠিটা তবে তাঁর খুবই জরুরী। শত হলেও পুত্রের চিঠি। কার অধিকার বেশি পরী যেন ভাবতে পারছিল না। সে ব্যাগ থেকে চিঠিটা বের করে বলল, এটা খুঁজছেন। আমার কাছে ছিল!

—তোমার কাছে!

পিলু পড়ে গেছে বিপদে। সেই চিঠিটা দাদার নিয়ে গিয়ে দিয়ে এসেছে। এখনও বাবা ঠিক বুঝতে পারছেন না—পরীদির হাতে চিঠিটা গেল কী করে!

কেমন অবুঝ শিশুর মতো পরীর দিকে তাকিয়ে থাকল মানুষটা—ছি! ছি! মিমি কী না জানি ভাবল তাঁর পুত্রের সম্পর্কে। কত বড় আশা ছিল বড় পুত্রকে নিয়ে। সেই পুত্র, পিণ্ডদানের অধিকারী যিনি, যিনি তাঁর পারলৌকিক কাজের প্রথম অধিকারের দায় বহন করছেন—তিনি কিনা একটি নিষ্পাপ মেয়ের মাথায় কলঙ্ক চাপিয়ে উধাও। —এত অমানুষ তুমি! মাথায় তোমার পোকা ঢুকে গেছে। পোকার কামড়ে যা খুশি আচরণ করতে পার—তা তোমার ব্যক্তিগত অভিরুচি, তাই বলে একটি নির্দোষ মেয়েকে তোমার নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে জড়াতে গেলে! তুমি তোমার মা বাবার মর্যাদার কথা ভাবলে না, মেয়েটির পারিবারিক মর্যাদার কথা তোমার মাথায় এল না। গায়ে হাত তুলেই ক্ষান্ত হলে না, তার মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গেলে। তুমি মানুষ। তুমি আমার পুত্র! কেন তুমি চলে গেছ, তার ব্যাখ্যা—পরীর জন্য চলে গেছ!

পরী বলল, বসে থাকলেন কেন। উঠুন।

পিলু উঠোন থেকেই সব লক্ষ্য করছে। কাছে যাওয়া ঠিক না। কারণ হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে বাবা, তারই জন্যে। চিঠিটা আসলে বাবা গায়েব করে দিতে চেয়েছিলেন—সেটা প্রকাশ্য দিবালোকের মতো সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। বাবার মাথা ঠিক থাকতে নাই পারে। বাবাকে তো

জানে, বড় অপকর্ম করেও দেখেছে, বাবার হাসি মুখ। যা হবার হয়ে গেছে—তাঁরই ইচ্ছে। হাত পা ধুয়ে পড়তে বসগে। আবার সামান্য খুঁত টের পেয়ে বাবা অগ্নিশর্মা। চিঠিটা নিয়ে বাবার এই এত জলে পড়ে যাওয়া কেন সে বোঝে না!

পরী হাত টেনে বলল, ইস কী করেছেন— এই মায়া, একটা গামছা নিয়ে আয়। চিঠিটা নিয়ে বসে থাকলেন কেন, দিন আমি রেখে দিচ্ছি। কোথায় রাখব বলুন।

পিলু দেখছে বাবা কেমন নিথর হয়ে গেছেন। বাবা তো এত ভেঙ্গে পড়েন না। দাদার কষ্টে, না চিঠিটা জানাজানি হয়ে গেল সেই কষ্টে। পরীর মাথায় কলঙ্ক চাপিয়ে গেছে তাঁর সু-পুত্র!

পরী আবার বলল, উঠুন মেসোমশাই। কাল থেকে আপনারা কেউ কিছু খাননি। বিলু ভালই আছে। আমি সব খবর নিয়েছি। ওর জন্য ভাববেন না। কলকাতায় ওর চেনা জানা বন্ধু আছে। আমাদের অপরূপা কাগজে তাঁরা লিখতেন। এখানকার কবিতা পাঠের আসরে তাঁরা এসেছেন। সঙ্গে তো টাকা পয়সা নিয়েছে। কলকাতায় একটা পেট যে কোনো লোক চালিয়ে নিতে পারে। ও তো লেখাপড়া জানা ছেলে। আপনি এত ভেঙ্গে পড়ছেন কেন। উঠুন।

পিলু দেখল, বাবা বের হয়ে গেলেন ঠিক, তবে তাঁর ভেতর আগের মানুষটা যেন নেই। মহা অপরাধ করেছেন এমন ভাব চোখে মুখে। এসে তিনি বারান্দায় বসলেন।

পরীদি জানে বাবাকে কী করে তুষ্ট করতে হয়। সেও জানে, মায়াও জানে। পরীদি নিজেই নারকেলের ছোবড়া ছিঁড়ে হাতে দ্রুত ঘষে একটি পিণ্ড বানিয়ে ফেলল। আগুন দিল সেই পিণ্ডস্থানে। তা কলকেয় রেখে ফুঁ দিতে দিতে বাবার দিকে এগিয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে বলল, মেসোমশাই, তামাক।

বাবা কেবল দেখছেন পরীদিকে।

পরীদি খুবই দ্রুত কাজ করছে। মা-র কাছে গিয়ে বলল, মাসিমা, উঠুন। বিলু ভালই থাকবে। বাবাকে যা যা বলেছে, মাকেও তাই বলল। তারপর পরেশবাবুর কাছে গিয়ে যে খোঁজখবর নিয়েছে তাও জানাল।

মায়া আর পরীদি যেন এখন বাড়িটায় সব। তারাই কোথায় কী আছে টেনে বের করছে। নবমী বুড়ি বলছে, আমায় দিনগো, কাটাকুটির কাজটা সেরে ফেলি।

পরীদি ডাকছে, এই পিলু, রান্নাঘরে দু-বালতি জল দে। তারপর যা গরুগুলি মাঠে দিয়ে আয়।

বাবা বসে বসে তামাক টানছেন। কোনো বিষয়ে যেন তাঁর আর আগ্রহ নেই। চাকরি ছেড়ে গেল, কোথায় গিয়ে উঠবে জানিয়ে গেল না, একটি নিষ্পাপ মেয়েকে জড়িয়ে দিয়ে গেল। এত সব অপকর্ম বাবার মতো মানুষের পক্ষে যে খুবই দুঃসহ পিলু বোঝে। পরীও মানুষটাকে দেখে দেখে ধাত বুঝে গেছে।

এখন যে কোনো প্রকারে মানুষটাকে ঠেলেঠুলে ঠাকুর ঘরে পাঠাতে হবে। আর মাসিমাকে তুলে চানটান করিয়ে কিছু মুখে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

পরী বলল, এই মায়া, রান্নাঘরে কাঠগুলো রেখে আয়। পরী এ-সব পারে। কারণ পরী ক্যাম্প করতে গিয়ে নানাভাবে নিজের মধ্যে মানিয়ে নেওয়ার, এবং পার্টি করতে গিয়ে নানা জায়গায় যথেষ্ট অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও বেশ আনন্দের সঙ্গেই রাত্রি দিন উজাড় করে দিতে পারার স্বভাব কবে থেকে যেন গড়ে তুলেছিল। সুহাসদা তাকে হঠাৎ কেন যে বলল, তোমার অসুবিধা হবে! আসলে মনে হয় দাদুই তাকে ফোনে সব জানিয়ে দিয়েছিল। সুহাসদা সেই ছেলেবেলা থেকে তাকে জানে। সুধীনদা জানে, শহরের এই মেয়েটি কিছুটা পাগলা আছে। এটা যদি পাগলামি হয় হবে। তার কিছু করার নেই। তার হাতে এখন কত কাজ!

পরীদি এক ফাঁকে এসে বলল, মেসোমশাই, চিঠিটা কোথায় রাখব।

বাবা বললেন, রেখে দাও, তোমার কাছেই রেখে দাও। পিলুকে দিতে যেও না। ওর তো কত বান্ধব! সে কী বোঝে কিসে কী হয়!

পিলুর মনে হল, যাক তবু যে বাবা কথা বলেছেন। বাবাকে সে জীবনেও অমন চুপচাপ হয়ে যেতে দেখেনি। একটা চিঠি সামান্য ফাঁস হয়ে যাওয়ায় বাবা এ-ভাবে আতান্তরে পড়ে যেতে পারেন এই প্রথম টের পেল। তার খুবই আতঙ্ক—যে বাবাকে সে দেখে গেছিল, ফিরে এসে যেন

অন্য বাবাকে দেখছে। বাবা কথা বলায় কেমন কিছুটা হালকা হতে পেরেছে। চিঠিটা পরীদিই রেখে দিল। আসলে বাবা বোধ হয় বুঝেছে, চিঠিটা দাদা বাবাকে লিখে যায়নি, তাকেও না—লিখে গেছে পরীদির কথা ভেবেই। পরীদি না থাকলে হয়তো দাদা চিঠিটা লিখে যাওয়ার প্রয়োজনও বোধ করত না।

এতে তার দাদার উপর ফের কেন যে অভিমান হল সে বুঝতে পারছে না।

মায়া কাঠ কুটো রান্নাঘরে নিয়ে রাখছে। পরীদি টিন থেকে মুড়ি বাতাসা বের করল। দুধ গরম করে থালায় ঠাণ্ডা হতে দিল। বাবাকে, মাকে, মায়াকে খেয়ে নিতে বলল, কিন্তু বাবা ঠাকুর-সেবা না করে জল গ্রহণ করেন না। পরীদি যে জানে না তা নয়। তবে আজ হয়তো পরীদির মধ্যেও কিছু গোলমাল সৃষ্টি হয়েছে।

বাবা বললেন, আমার তো পূজা আছে মা। তুমি নিয়ে যাও।

—একটু খেলে কিছু হবে না।

—না না।

—তবে তাড়াতাড়ি যান।

কারণ শুধু তারা কেন, পরীদিও জানে বাবা আজ ঠাকুর ঘরে ঢুকলে কখন বের হবেন কেউ বলতে পারবে না। যদি একশ একটা তুলসীপাতা নারায়ণ শিলার মাথায় চাপান—তবে দুপুর পার করে দেবেন। আর যদি মনে মনে সহস্র তুলসী স্থির করে থাকেন তবে তো হয়েই গেল। বেলা পড়ে যাবে—বাবা পদ্মাসনে বসে থাকবেন। আর উৎসর্গ করবেন সহস্র তুলসীপাতা। জীবনের অজস্র বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার এই উপায় বাবার জানা আছে বলেই তিনি এই বনজঙ্গলের মধ্যে ঘর বাড়ি বানিয়ে নিরুপদ্রবে বসবাস করতে পেরেছেন।

পিলু লাফিয়ে লাফিয়ে কাজ করছে। দু-বালতি জল রান্নাঘরে রেখে দিল। সে গোয়াল থেকে গরু বের করে মাঠে দিয়ে এল। বাবা কিছুদিন থেকে বাড়ির কাজের লোক খুঁজছিলেন। নিরাপদদাকে রাখার কথা হয়েছিল। কিন্তু মা-র পছন্দ না। মাথায় গোলমাল আছে। কিন্তু তার খুবই পছন্দ নিরাপদদাকে। বাবারও।

বাবার এক কথা, কার মাথায় গণ্ডগোল নেই ধনবৌ। সবাই গোলমালে ভুগছে। গোলমালেই সংসার। গোলমালেই জন্ম মৃত্যু। গোলমালে পড়ে গিয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঘুরছে বোঁ বোঁ করে। কে কার মাথার দিব্যি দিয়েছিল বল, বোঁ বোঁ করে ঘুরতে। এমন ঘোরা শুরু হয়েছে তেনার কবে থামতে পারবেন জানেন না। থামলেই প্রলয়।

মা-র এক কথা, এই শুরু হল।

বাবা খুবই কাতর গলায় বলেছিলেন, নারে নিরাপদ, বাড়ির দেবী তোর প্রতি তুষ্ট হতে পারছেন না।

নিরাপদদাও ছাড়বার পাত্র না।

তারও এক কথা।

—কর্তা রাখেন, রেখে দেখেন। আমি বলরামবাবুর বাগানে ছিলাম। মাঠে পড়ে থাকতাম। কর্তা একটাই মহা-অপরাধ। ভাত বেশি খাই বলে ছাড়িয়ে দিল।

—তুমি ভাত বেশি খাও বলে ছাড়িয়ে দিয়েছে, না রাতে এর ওর বাড়ি ঢিল মেরে বেড়াও বলে তাড়িয়ে দিয়েছে। মা-রও এক কথা!

ধরা পড়ে নিরাপদদা মা-র দিকে আর তাকাতে পারল না। তার এই একটা ব্যামো আছে। রাত হলেই, তার মাথায় পোকা ঢুকে যায়। যে যখন অপমান করে মনে রাখে। একবার বাবুদের কাঁসার থালা হারাল বলে গাছ-পেটা করল। বগি থালাটা সে নিয়েছিল ঠিক তবে ধরতে পারেনি। বাজারের মুকুন্দ হালদার মশাই ওজনে মেরেছে—তাতেও কষ্ট ছিল না। পয়সা কম দিয়েছে তাতেও কষ্ট ছিল না। কিন্তু সে পাউরুটি চা খেয়ে দোকানে সব টাকা ফুটিয়ে দিতেই মনে হল—আরে আরও ক'দিন পাউরুটি চা খেতে পারত। সে বিড়ি খায় না, ভাত খায় না, নেশা নেই—একটাই নেশা সকাল হলে বাদশাহী সড়কে বসে সকালের দিকে এক কাপ চা আর কোয়াটার পাউণ্ড পাউরুটি। চা-এ পাউরুটি ভিজিয়ে খাবার নেশাটাই যত নষ্টের গোড়া। সে তখনই টের পেল মুকুন্দ হালদার তাকে ঠকিয়েছে। ঠকিয়েছে বলে, এমন প্রিয় খাওয়া থেকে নিরস্ত হতে হল আচমকা। চোর ছ্যাঁচোড় মুকুন্দ হালদারের কাছে গিয়ে চোটপাট।—মাপেন, থালাখানি আবার মাপেন!

—কিসের থালা?

—ক্যান যে বগি থালাখান দেলাম।

—দেলাম! শূয়ার তুই আমারে থালা দিয়েছিস!

—দেলাম না। ওজনে মারলেন।

—পেলি কোথায় থালা। বল কোথায় পেলি!

—সে দিয়া কাম কি!

মুকুন্দ আর নিরাপদ লড়ালড়ি।

মুকুন্দ তাকে বলে, চোর।

সে মুকুন্দকে বলে, চোর।

বাবুমশাই জানতে পেরে বলেন, এই মুকুন্দ, দেখি থালাখানা।

মুকুন্দ বাবুমশাইকে ভয় পায়। সে নিয়ে দেখাল।

আরে এটাতো সেই থালা!

ধর ধর।

নিরাপদ দৌড়ায় বাবুমশাইয়ের চাকর-বাকর দৌড়ায় এবং তাকে ধরে ফেলে গাছপেটা করলে, এক কথা তার, মারেন, যত খুশি মারেন। আমার দোষ নাই। ভূত ছাইড়া দিলে মজা বোজবেন! খুদা পাইলে কার দোষ। আমার! কার খিদা পায়না কন।

সেই ভূত নিরাপদ নিজে। গভীর রাতে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যায়। আর ইট পাথর কুড়িয়ে বাবুমশাইয়ের বাড়ির ছাদে ঢিল। টিনের ঘরে ঢিল—বন বন। ঝন ঝন। ধপাস। সে চরকি বাজির মতো দু-হাতে এত দ্রুত ঢিল ছোঁড়ে যে বাড়ির মানুষজন ভাবে, ভূতের কাণ্ড—নিরাপদ ভূত ছেড়ে দিয়েছে—হলে কী হবে, একবার ধরা পড়ে যেতেই তার এই যাদুবিদ্যাটা অকাজের হয়ে গেল। জানাজানি হয়ে গেল, নিরাপদের কাজ।

নিরাপদদা ওঠার সময় বলে গেছে, ঠাইনদি কথা দিতে পারি, কর্তার হুকুম ছাড়া নড়ানড়ি করমু না। জান দিয়া কাজ করমু। দুই বেলা দুইডা বেশি ভাত দিয়েন, দু'মাসে ন'মাসে একখানা গামছা। বছরে একখানা কাপড়। টাকা পয়সা মনে যা লয় দিবেন। সক্কাল বেলায় ছাইড়া দিবেন, চা-পাউরুটি খাইলে সারাদিন আপনার বান্দা হইয়া থাকুম।

মা কিছুতেই রাজি হয়নি।

নিরাপদদা দাদা নেই খবর পেয়ে এসে গেছিল। গরুগুলি মাঠে দিতে গেলে বলল, যান পিলুদা বাড়ি যান। বাড়িতে কর্তার কত বড় বিপদ! কানে গেল আর ছুইটা আইলাম। ঘাস কাইটা নিয়া যামুনে। কর্তার বাড়িতে দুইডা যেন অন্ন পাই। বিলুদার নাকি মস্তিষ্ক বিকৃতি হইছে। পালাইছে।

—কে বলেছে মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে। নিরাপদদা, যা জান না বলবে না।

—না হলে পালায়! কেউ পালায় কখন। আমি পালাই সক্কালবেলায়, এই গাছপালা বন জঙ্গল, বাদশাহী সড়কে হাঁইটা বেড়ান বুঝবেন মজাটা! জোৎস্না রাতে বালির ঘাটে গেলে ফিরতে ইসছা হয় না। মারুক ধরুক, আমাকে লোকজনে চেনে। এডা কম কথা—আমি নিরাপদ, যে যার মতো মনে লইয়ে ভাবে—চোর--পাগল, ছাগল কী না কয় আমারে কন। আমি পালাই—পালাইতে পারি! নিজের রাজত্ব ছাইড়া কেউ পালায়।

সেই নিরাপদদা এসে হাজির। এক বোঝা ঘাস মাথায়। বাবা বরান্দায় বসেছিলেন। উঠোনে এসে ঘাসের বোঝাটা ফেলে সটান মাটিতে সোজা হয়ে গেল।

পরী মায়ার দিকে তাকালে, মায়া মাথায় আঙুল ঠেকিয়ে দেখাল। মাথার গোলমাল আছে।

বাবা বললেন, ঘাস নিয়ে এলি নিরাপদ।

—হ কর্তা। ঘাস। বিলুদা চইলা গ্যাছে বইলা মনে কষ্ট। আপনের মনে কষ্ট। পিলুদা একলা পারব ক্যান। এক বোঝা ঘাস নিয়া আইলাম, দ্বিপ্রহরের অন্নভোজন—যদি কৃপা করেন।

পরী দেখল, লোকটা পরেছে খোট। খালি গা। মাথা ন্যাড়া। মাথায় খুসকি। থুতনিতে দাড়ি। চোখ কোটরাগত।

মাথার দিকে তাকাতেই পরীকেও প্রণিপাত করে ফেলল। নিরাপদ পরীকে ভাল চেনে। একবার সে পরীদিকেও গাছের আড়াল থেকে ঢিল মেরেছিল—পরীদি বলল, তুমি পঞ্চাননতলায় থাক না!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বলে দু-দন্তপাটি বিকশিত হাসি। —আপনে আমারে মনে রেখেছেন দ্যাখছি।

পরীর কেমন মায়া ধরে যায়।

পরী বলল, থাক। খাবে। গোয়াল পরিষ্কার করতে পারবে।

—হ্যাঁ।

—যাও। দেখে শুনে হাত লাগাও।

পিলু দেখল, একবার কাউকে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করল না পরীদি। পরীদির কথায় বাবা খুবই তুষ্ট হয়েছেন। মেয়েটার মধ্যে মানুষের জন্য মায়া মমতা আছে। তার দ্বিতীয় পুত্রটির মতোই।

নবমী নিজেই বঁটি নিয়ে এল। লাউ-এর মাচান থেকে নরম ডগা কেটে আনল। মাচানের নিচে বসে কচি লাউ হাত দিয়ে দেখল। ভারি মজা লাগে দেখতে। কিন্তু লাউ কেটে হাতে নিয়ে যাবার তাগদ নেই। দা-ঠাকুর এসে হাজির।—তুমি পারবে! বলতে পার না। পিলু লাউ কেটে নিয়ে এল। জমি থেকে বেগুন তুলে এনে পরীদিকে দিল।

এবং পরীদি তখন বলল, মায়া, মাসিমার একটা শাড়ি বের করে দেতো।

মায়া মাকে কিছু বলল না। কারণ সে জানে সামান্য দামের শাড়ি-ব্লাউজ পরীদি পরলে মা খুশি হবে।

আসলে কে জানে কোথায় থাকে মানুষের অবলম্বন। পরী এসে বাড়িটার হাল ধরায় সবার মধ্যেই আবার স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে। বাবা বললেন, মায়া, তেল দে। চানে যাই। ভেবে আর কী করব!

মা-ও বলল, তুমি পারবে না পরী! তোমার অভ্যাস নেই। আমি যাচ্ছি।

ক্রমে সব কেমন সচল হয়ে উঠছে সংসারে ফের। পরীদি তবু পুকুর থেকে চান করে এল। আসার সময় হাতে করে এক বালতি জলও নিয়ে এসেছে।

নবমী লাউ কেটে দিল ডুমো ডুমো করে। মুগের ডালে লাউ, বেগুন ভাজা, পিলু গিমাশাক তুলে এনেছে। গিমাশাক ভাজা। তেঁতুল দিয়ে লাউ-এর চাটনি। কচু, ডাটা আলু আর লাউ-এর ডগা দিয়ে তরকারি।

বাবা ঠাকুর ঘরে ঢুকে গেছেন। আর আশ্চর্য বাবা নিত্য পূজার মতোই সময় নিলেন। একশ একটা তুলসী দিলে ঠাকুরকে এত তাড়াতাড়ি কখনও

বের হতে পারতেন না। তিনি বের হয়ে এসে হাতে প্রসাদ দেবার সময় দেখলেন, পরী বারান্দায় আসন পেতে দিচ্ছে। জলের গ্লাস সাজিয়ে দিচ্ছে। থালায় ভাত বেড়ে দিচ্ছে। এমন কি মাসিমাকেও বলছে, আপনি বসে পড়ুন। আমি দিচ্ছি। নবমীকে বলছে, তোমার পাথরের থালা বের করে বসে পড়। নিরাপদকে ডেকে আনার জন্য পিলুকে পাঠাল। কোথায় গিয়ে বসে আছে কে জানে।

পিলু ডাকছে, ও নিরাপদদা, কোথায় গিয়ে বসে থাকলে!

নিরাপদ অন্ন ফেলে বসে থাকার লোক না! কোথায় গেল! কেউ তাকে যদি আটকে রাখে। রাখতেই পারে। কোথায় কী অপকম্ম করে বেড়ায়, নিরাপদকে দেখলে, লোকজন অনেক সময় দূর দিয়ে হাঁটে। কারণ—পাগল, ছাগল মানুষ, বেধড়ক মার খেলেও মাথা গরম করে না। উ আ করে না। কেবল হাসে। ঘটি বাটি বাইরে রাখা দায়। গাছের ফল রাতে চুরি করার অভ্যাস। কোন টানে পড়ে গেছে কে জানে!

পরী বলল, পিলুকে ডাক। বসে যেতে বল। নিরাপদ এলে, ওকে দিয়ে আমি বসে পড়ব।

পিলু এসে বলল, আসছেন।

আসলে নিরাপদর এত দেরি হবার কারণ এতক্ষনে টের পেল পরী। একটাই খোট। চান করেছে, খোটের একটা দিক ধরে বাতাসে শুকিয়েছে। শুকনো দিকটা পরে ভিজা দিকটা শুকিয়েছে। সে দেখেছিল, পুকুরের অন্য ঘাটে সে স্নান করছে। পুকুর না বলে দীঘিই বলা ভাল। সে মায়া পিলু একসঙ্গে সাঁতার কেটেছে। ডুব দিয়েছে। বাড়ি থেকে নেমে একটা জমি পার হয়ে দীঘিটা। এখনও এদিকটায় বাড়িঘর হয়নি। জঙ্গল আছে। পায়ে হাটা সরু পথ। শুধু এ-পাড়ার মানুষজনই পুকুরটা ব্যবহার করে। বেশ গভীর এবং কালো জল, এর পাড় দিয়ে পরী পিলুর সঙ্গে একবার বড় সড়কে উঠে গেছিল—কেন যে মনে হয়েছিল, কোনো দিন সুযোগ পেলে দু'জনে এই ঠাণ্ডা জলে অবগাহন করবে।

আজ করেছে ঠিক, তবে বিলু ছিল না। পিলু ছিল আর মায়া ছিল। তখন কিন্তু ও-পাড়ের ঘাটে সে কাউকে প্রথমে দেখেনি। পরে দেখতে পেয়েছে। তেল মাখার জন্য হাতে তেল নিয়েছে। হাতে পায়ে চপ চপ

করছে তেলে। যখন নিরাপদ ফিরে এল, হাতে একটা লাঠি। এক হাতে দা, যেন স্নান টান সেরে পবিত্র হয়ে সে বান্দর লড়ির মূল তুলে এনেছে। কেন এনেছে জানে না। এ-জন্যও দেরি হতে পারে।

নিরাপদ লাঠিটা ঠাকুর ঘরের বারান্দার চালে গুঁজে রেখে খেতে বসল। পরী আর মায়া পরিবেশন করছে। দুটো বড় কলাপাতা কেটে নিরাপদ অন্ন রাখার জায়গা বড় করে নিয়েছে। ওর পাত বিছানো দেখেই পরী বুঝেছে, প্রথমেই অনেকটা ভাত দিতে হবে। না হলে ত্রাসে পড়ে যাবে। কতটা খেলে পেট ভরে সে বোধ হয় ভাল জানে না। নিরাপদ ভাত সাজিয়ে বলল, কাচা লংকা নাই ঠাইরেন?

তারপর নিরাপদ কী ভেবে নিজেই উঠে গেল। গেরস্থরা কোন জমিতে কী লাগিয়েছে, চোখে চোখে রাখার স্বভাব। রান্নাঘরের পেছনে দুটো বারোমেসে লঙ্কা গাছ আছে এ-বাড়িতে সে তারও খবর রাখে। গোটা ছয়েক কালো ধানি লঙ্কা পাতের কিনারে বোঁটা সহ সাজিয়ে রাখল। পাশে নুন দিল মায়া। তার খাওয়ার প্রতি যত্নআত্তি দেখে পরী কেমন মুহ্যমান হয়ে যাচ্ছে। এত যত্ন করে কেউ খায়! খাবার আগে কিছু অন্ন হাতে নিয়ে কপালে ঠেকাল। কিছুটা খেল। উঠোনে সে খেতে বসেছে। কাক শালিক উড়ছে, ঘুরছে। সে কিছুটা অন্ন কাক শালিকের নামে পাতের কিনারে বোধ হয় রেখে দিচ্ছে।

বাবা বলছেন, পরী, তোমরাও এবার বসে পড়। নিরাপদর দিকে তাকিয়ে বলল, পেট ভরে খাস। পরী না এলে দুপুরের খাওয়া আজ জুটত না। আমরাও তোর মতো নিরাপদ হয়ে থাকতাম। নবমী বসেছে, তার চালা ঘরটায়। দাঁত নেই। মাড়ি দিয়ে চিবিয়ে খায়। খুবই সময় লাগে। তার পাথরের থালার পাশে পরী সব সাজিয়ে দিয়েছে। খুবই স্বল্পাহারী নবমী সে জানে।

পিলু দেখল, বাবা যেন কী খুঁজছেন।

আসলে বাড়িতে আজ বাবার প্রায় ছোটখাটো ভোজ। গরুর দুধের সামান্য পায়েসও করেছে পরীদি। পরীদি এত দ্রুত কাজ করতে পারে, বরং কে বলবে, পরীদি তাদের কেউ হয় না।

বাবা পিলুর দিকে তাকিয়ে আছেন। তার পাশে সামান্য ফাঁকা জায়গা

রয়েছে। বাবার কাছে এই ফাঁকা জায়গাটা কেন এত আগ্রহ তৈরি করছে সে বুঝতে পারছে না। তার দিকে তাকিয়েই বাবা চোখ নামিয়ে আনছেন ফাঁকা জায়গাটায়। যেন এখানে বসে আজ কারো অন্নগ্রহণ করার কথা ছিল। সে অন্নগ্রহণ করেনি। কোথাও সে চলে গেছে। আর পাশে রান্নাঘরের দরজায় পরীদি। পরীদিও বাবার এই অন্যমনস্ক চোখ দেখে কিছু টের পেয়েছে। একজন মানুষের মধ্যে কোথাও যে হাহাকার রয়েছে—পরী টের পেতেই রান্নাঘরের ভিতরে ঢুকে গেল। আর দেখল বাবা মাথা নিচু করে খাচ্ছেন। বাবা তো সোজা হয়ে খান। কখনও মুখ আড়াল করে খান না। বাবা কী দাদা এই ভোজে নেই বলে, ভেঙ্গে পড়েছেন। কাঁদছেন!

নিরাপদদা হঠাৎ বাবার দিকে পলকে তাকিয়ে কী বুঝল কে জানে। কারণ সে উঠোনে খেতে বসেছে। উঁচু বারান্দায় বাবা। উঠোন থেকে তাদের চেয়ে বাবার মুখ নিরাপদর কাছে বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। সে বলল, কর্তা নিজে পেট ভইরা খান। শোকতাপ কইরা কী করবেন! কপাল। আপনের মনোকষ্টের কথা জাইনা নিরাপদ আইজ যা করল! বলেই সে বারান্দার চালা থেকে বাঁ-হাতে লাঠি বের করে দেখাল।—এই যে লাঠিখান দ্যাখছেন, এটার গুণ অনেক। লাঠি চালান দিলাম। মাথার উপরে আকাশ, নিচে ধরণীতল, আর আপনের মতো সৎ মানুষের কাছে মিছা কথা কইলে জিভ খইসা পড়ব। ভাইবা দ্যাখেন লাঠিটারে চালান দিলাম ক্যান। ছয় মাসের মধ্যে বিলুবাবুরে দুরমুজ কইরা বাড়িতে ফিরাইয়া যদি না আনে আমার নামে কুত্তা পুইষেন।

পরী বলল, ঠিক আছে, লাঠিটা রেখে দয়া করে খাও।

পরীর দিকে তাকিয়ে নিরাপদদা বলল, খাওয়ন ত ফুরাইয়া যাইব না। কিন্তু কথা থাকব। যা কথা তা কাজ। অন্ন মুখে দিয়া কথা কইছি। আকাম, কুকাম করতে পারি, কিন্তু মানুষের অনিষ্ট করি নাই। বেদ বাক্য, ব্রহ্ম বাক্য দুইখান কথা আছে। লাঠিখান গুঁইজা রাইখা দিলাম। ছয় মাস পরে দেখতে পাইবেন লাঠির গুণ।

পিলু জানে, নিরাপদদা তুকতাক জানে। তার কেন জানি অবিশ্বাস হল না। দাদা ফিরে আসবে—এমনিতেই আসার কথা, দাদাই লিখে

গেছে—নিরাপদদা কেন যে বলল, দুরমুজ কইরা নিয়া আইব।

বাবা এতক্ষণে নিজেকে বোধ হয় সামলে নিয়েছেন। তিনি মুখ তুলে বললেন, নিরাপদ, পাগলামি করিস না। খা। মা অন্নপূর্ণা তোদের খাওয়া হলে খাবেন।

কেউ আর এখন পরীকে দেখতে পাচ্ছে না। আসলে তাকে নিয়েই এ-পরিবারে এত বড় অশান্তি। সেই কারণ। তার বোধ হয় খারাপ লাগতে পারে। কে জানে কোথায় সে! আড়ালে লুকিয়ে থাকাই স্বাভাবিক।

বাবা তখন ডাকলেন, একটু পায়েস আর হবে মা। বড় সুস্বাদু হয়েছে। মা-র দিকে তাকিয়ে বললেন, কী বল, দেবী ভোগ মনে হচ্ছে না। মা কথা বলতে পারছিল না। তারও গলা ধরে গেছে।

পরীদি এক বাটি পায়েস পাতে দিতে গেলে, বাবা হা হা করে উঠলেন। —আরে করছ কী। তোমার জন্য রাখলে না। মায়া তুমি—না না আর দেবে না!

—খান না মেসোমশাই।

—একলা খেলে চলে।

তবু পরী জোরজার করে আরও এক হাতা দিতে গেলে, বাবা বললেন, মৃন্ময়ী, আমরা এ-দেশে এসে অগাধ জলে পড়ে গেছিলাম। ভাল মন্দ খাওয়ার কথা ভুলেই গেছিলাম। ভোজ হলে মাথা ঠিক রাখতে পারি না। কিন্তু তোমার জন্য না রাখলে যে খেয়ে শান্তি পাব না। আর দেবে না!

মৃন্ময়ী দেখল, মেসোমশাই বড় তৃপ্তির সঙ্গে চেটেপুটে পায়েসটুকু খেলেন। দিলে আরও খেতে পারেন। কিন্তু সে না খেলে তিনি কষ্ট পাবেন।

পিলু পায়েসের বাটিটা দেখছে।

মৃন্ময়ী বলল, তুই আর এক হাতা নে!

মা তখন না বলে পারল না। —তুমি কাকে দিচ্ছ! সে দিলে না করে কখনও! পেটুক। না না ওকে দেবে না! তুই কিরে পিলু, মেয়েটা একটু খাবে না।

পিলু বলল, থাক মিমিদি। দেখ না মা রাগ করছে।

বাবা তখন হাত চাখছেন। বললেন, অনেকদিন পর বড় তৃপ্তির সঙ্গে

খেলাম। অন্নপূর্ণার রান্না। স্বাদই আলাদা। আর দেরি কর না মৃন্ময়ী। এবারে তোমরা বসে পড়।

পরী হঠাৎ ছুটে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। সে তার উদ্গত অশ্রু রোধ করতে পারছে না। মানুষের কাছে এর চেয়ে বড় তীর্থ আর কী আছে সে জানে না।

॥ সাত ॥

বিকেল পড়তেই নবমীর সঙ্গে পিলুর চোটপাট শুরু হয়ে গেল। নবমী আজকাল বাবাঠাকুরের বাড়িতে উঠে এসে চোপা করতে শিখে গেছে। অবশ্য পিলু জানে, নবমীর চোপা আগেও কম ছিল না। কেবল তাকে দেখলেই বুড়ির মাথা ঠাণ্ডা হত। তার সমবয়সীদের উৎপাতের কথা জঙ্গলটায় ঢুকলে বুড়ির কাছে শুনতে পেত। নবমীর নালিশ ছিল, দেখেন দা-ঠাকুর আমারে ঢিল মেইরেছে। দ্যাখেন—বলে পায়ের গোড়ালির উপর হাত দিয়ে দেখাতেই চটে গেছিল—নাম জান, কে, কে করেছে!

নবমী মাথা নেড়েছিল।

—মুখ চেন?

নবমী তাও যেন ঠিক জানে না। তবু যারা পরিত্যক্ত ইটের ভাটার বনজঙ্গলে ঢুকে উৎপাত করতে পারে তাদের সে চেনে। সবাইকে নবমীর কাছে নিয়ে গেছিল।

নবমী ঠিক চিনতে পেরেছিল।

—তুই ঢিল ছুঁড়লি!

—আমারে আকথা কু-কথা কয় পিলুদা।

নবমীর সাফ কথা, না দা-ঠাকুর, মিছা কথা।

—তুমি আমারে ছাগলের বাচ্চা কও নাই।

—হ কইছি।

—তুমি আমারে কও নাই ওলাওঠা হইয়ে মরবি।

—হ কইছি।

—তুমি আমারে কও নাই বংশে বাতি দিতে থাকব না।

—হ কইছি।

পিলু নবমীকেই তেড়ে গেছিল। —কেন বললে। বল। ছাগলের বাচ্চা কেন বললে। এটা কু-কথা না!

—আমার ছাগলের বাচ্চা কি নিয়া নিব কয়। কু-কথা হইব ক্যান।

—তুমি বোঝ না ভয় দেখায়।

—ঘর থেইকে তাড়িয়ে দেবে কয়।

—এটা ঘর! এটাতে মানুষ থাকতে পারে! বনজঙ্গলে থাক, আর এটা তোমার ঘর হয়ে গেল।

—আমার স্বামীর ভিটে পিলুদা। বনজঙ্গল বলেন ক্যানে!

—স্বামীর ভিটা! ভয়ে তো মর। রাতে সাপ ঢোকে। সারারাত ঘুমাও না। লাঠি নিয়ে দরজায় বসে থাক। শেয়ালে খাটাশে টেনে নিয়ে যখন যাবে, কে রক্ষা করবে! হ্যাঁ কে তোমাকে রক্ষা করবে বল। শাপশাপান্ত করলে ঢিল ছুঁড়বে না।

তারপর পিলু কেমন ফুঁসে উঠত—তোরাই বা কী! বুড়ির কিছু আছে। নবমীর কাছে তোদের নিয়ে আসাই ঠিক হয়নি! আগে তো ভয়ে জঙ্গলটায় ঢুকতিস না।

—না পিলুদা, বনটায় ডাইনি থাকে। লোকে স্বচক্ষে দেখেছে। নবমী ডাইনি! হ্যাঁ—কি রে, কথা বলছিস না কেন! বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। ফলপাকুড় যা পায় খায়। ছাগলটা নিয়ে জঙ্গলের মাঠে ঘাস খাওয়ায়। গাছের সঙ্গে কথা বলে, সে কী মানুষ আছে! একটা গাছ হয়ে গেছে না! গাছের সঙ্গে তোদের যত বাঁদরামি! আর কোনোদিন নবমী যদি নালিশ করে ঠ্যাং ভেঙ্গে খোঁড়া করে দেব বলে দিলাম।

—পিলুদা, একখানা কথা!

—কী কথা আবার।

—নবমী য্যান আমাদের ছাগলের বাচ্চা না কয়।

—নবমী, আর কখনও যদি শুনি, এদের মুখ করেছ, তবে তোমার ভাত জল বন্ধ। তোমার খোঁজখবর নিতে আমার বয়ে গেছে।

—না দা-ঠাকুর, মুখ কইরব না। আপনি না এইলে আমার যে দিন যায় না দা-ঠাকুর।

সেই দা-ঠাকুরের সঙ্গে নবমী চোপা শুরু করেছে। পরী আর মায়া বিলুর তক্তপোষে শুয়েছিল। ভাদ্র মাসের গরম। জানালার খলপাটা তুলে দেওয়ায় ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। কোথাও বৃষ্টি হয়েছে। আকাশে দুপুরের দিকে মেঘ করেছিল, আবার মেঘ কেটে গেছে। সামনের মাঠটায় আউস ধানের চাষ—ধান পেকে গেছে, জানালায় বসে, সব দেখা যায়। ঘরটা তার এত চেনা, মনেই হয় না এটা তার পরবাস।

পিলুর এক কথা, পারব না। রোজ রোজ বায়না। কে নিয়ে যায়। মানুষের আর কাজ কাম নেই। এই সেদিন গেলে স্বামীর ভিটে দেখতে। আজ আবার মাথায় ক্যাড়া উঠেছে। আমি পারব না। স্কুলের মাঠে ভলিবলের কোর্ট কাটতে যাব।

মিমি ঠিক বুঝতে পারছে না কেন বুড়ির এত চোপা! নবমী বুড়ির বনটা সেও চেনে। একবার কারবালার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আসার সময় নবমী বলেছিল, জান পরীদি, এই জঙ্গলটায় একটা বুড়ি থাকে।

মিমি অবাক হয়ে গেছিল শুনে।

সেই প্রথম তার বিলুদের বাড়ি দেখতে আসা পালিয়ে। লক্ষ্মীকে নাকি বিলুই সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। রাস্তাটা লক্ষ্মী সে-জন্য চেনে। কালীবাড়িতে বিলুর সঙ্গে জোর করে পরিচয় করতে গিয়েই ফ্যাসাদ। মজা করার জন্যই বলেছিল, তোমাদের বাড়ি আমি যাব। লক্ষ্মী আমাকে নিয়ে যাবে বলেছে। মুখচোরা স্বভাবের বিলু সহসা ক্ষেপে গিয়ে বলেছিল, গিয়ে দেখ না!

—কেন ঠ্যাং ভেঙ্গে দেবে।

—কী করব গেলে বুঝবে।

সেই থেকে তার জেদ। এবং এই জেদ শেষ পর্যন্ত তাকে বিলুর আত্মপ্রকাশের জন্য মরিয়া করে তুলবে যদি আগে টের পেত—তবে বোধ হয় এ-ভাবে গলায় তার কাঁটা ফুটে যেত না। বিলুর আত্মপ্রকাশের জন্যই যেন অপরূপা কাগজ, কবিতা পাঠের আসর—এবং এক জলছবির মতো একজন বাদ্যকার মাঠ দিয়ে ঢাক বাজিয়ে যায়। গভীর নিশীথে আশ্চর্য স্বপ্নের মতো একজন পুরুষ তার পাশে থাকুক—যার মধ্যে সে কোনো নীরব এবং নিশ্চিত মাধুর্য টের পাবে। তারই প্রতীক্ষায় সে আছে। এবং মায়া আজ তার পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার পর বিলুর সেই আক্ষেপ বার

বার কিছু শব্দমালার মধ্যে খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছে। পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, বিলু যেন ঠিকই লিখেছে—পরী আমার সর্বনাশ। পরী আমার আকাশ বাতাস। গভীর রাতে নির্জনে হাঁটি। দেখি নক্ষত্র হয়ে সে আছে। মাথার উপরে। তার ডানার ঝাপটায় ধুলো ওড়ে। ওড়ে কাঙ্গালের বসন। উলঙ্গ করে দেয় অজ্ঞাতে— —পরী আমার সর্বনাশ/জীবনে/ বীজবপনে/ বিসর্জনে/

পরী বার বার উচ্চারণ করছিল, জীবনে, বীজবপনে, বিসর্জনে। এই কথাগুলি ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকাল থেকে যা গেছে। আর ঘুম ভাঙতেই সে শুনছে কী…।

পিলু বলছে, ডাকাতের বৌ, তার আবার স্বামীর ভিটে!

ছি পিলু! তুই ও-ভাবে বলিস না। ডাকাতের বৌ নবমী!

পরী পায়ে শাড়ি টেনে দরজা খুলে বের হয়ে এল। কিন্তু আশ্চর্য পাশের ঘরে মাসিমা, মেসোমশাই নির্বিকার। তারা অন্য কোনো বিষয় নিয়ে মনে হয় কথা বলছে।

পিলু আর নবমীর এই কথা কাটাকাটি তারা যেন গ্রাহ্যই করছে না।

পরীর এটা ভাল লাগল না।

সে দেখল বুড়ি কোরা থান পরে হাতে লাঠি নিয়ে বসে আছে। কিছুটা অচল। লাঠি ভর দিয়ে উঠতে পারে। কিছুটা যে হেঁটে বেড়ায় তাও লাঠির সম্বলে। সেই নবমীর কী গলা। ডাকাতের বৌ বলাতেও কোনো আক্ষেপ নেই। কোথাও যাবে বলে সে প্রস্তুত। বাধ সেধেছে পিলু।

পরী বলল, কী বাজে বকছিস পিলু!

—আর বল না পরীদি, এই সেদিন ধরে ধরে নিয়ে গেছি। হাঁটতে পারে না। দু-পা গিয়ে পড়ে যায়। না ধরলে মুখ থুবড়ে পড়ে মরে থাকবে। তা তোকে কে বাবাঠাকুরের বাড়ি উঠে আসতে বলেছিল! ডর লাগে! ডর। ধনে তার যখ লেগেছে। ঘুম হয় না। লাঠি নিয়ে দরজায় ধপাস ধপাস। না আমি পারব না। একা পার তো যাও।

পরী বলল, কিরে যা না। এত করে বলছে। তার স্বামী ডাকাত তোকে কে বলেছে!

—কে আবার বলবে! জিজ্ঞেস কর না। না বললে আমরা জানব কী

করে ! তিনি নাকি ডাকাতের বৌ ছিলেন। এক বারে গরিমায় পা পড়ে না। ফোকলা দাঁতে কী হাসি, কী নাচ, সে যদি দেখতে। ডাকাতের বৌ বলেই নাচ শুরু। লাঠিতে ভর করে ঘুরে ঘুরে কোমর বাঁকিয়ে নাচ—যদি দেখতে !

ডাকাতের বৌ, নবমী ডাকাতের বৌ—পরী বড় বড় চোখে দেখছিল। কেমন ডাকাত, কোথাকার ডাকাত, খুনটুন কত করেছে কে জানে ! তবে কী জঙ্গলের মধ্যে থাকত ডাকাতের বৌ বলেই। কিন্তু পরী এটাই বা কী দেখছে ! ডাকাতের বৌ বলায় নবমী কী খুশি।

নবমী লাঠি ভর দিয়ে ওঠার সময় কঁকিয়ে বলল, ডাকাতের বৌ বলে কী আমার স্বামীর ভিটে থাকতে নাই। লিয়ে না যান, একাই চইললাম।

পিলু সেই মতো এক দুর্বাসা যেন।—পা বাড়িয়ে দ্যাখ কী করি ! যাও ঘরে। বারান্দায় বসে থাক।

ইস্ পিলুটার মায়া দয়া নেই ! জঙ্গলের মধ্যে স্বামীর ভিটে, বেশি দূরেও না, পরী বলল, চল নবমী, আমার সঙ্গে চল।

মায়া বের হয়ে বলল, তুমি যাবে ! আমিও যাব।

পিলু বলল, তবে আমিও যাব।

বাবা ঘর থেকে বের হয়ে বললেন, দিলে তো মাটি করে। নিত্যকার যাত্রাপালাটা দেখতে পেলে না। রোজ বিকাল হলে নবমীর নাকি মন কেমন করে ! আর সাধাসাধি। পিলু যাবে না। নবমীর গোঁ যাবে। ডাকাতের বৌ বলে তারও জেদ কম না। দু'জনের তর্ক দেখলে তোমাদের হাসি পেত।

পিলু বলল, জান পরীদি, কী আস্পর্ধা। বলে, কি না যোয়ান মানুষটা সামনে নাই। থাকলে দেইখতেন। তাঁর বধূরে নির্যাতন ! এক আছাড়ে ছাতু কইরে ফেলত। গোট গোট মল বানিয়ে দিয়েছিল। ঘাঘড়া। রেইতের বেলা ফিরে এইলে কোমরে হাত দিইয়ে নেইচেছি কত—কী যেন সব বলে না ! তারপরই নবমীর দিকে আঙুল তুলে বলল, মনে রেখ তুমি ডাকাতের বৌ, আমি বামুনের পোলা। এক ফুয়ে উড়ে যেত তোমার মরদ।

পিলু ব্রাহ্মণ সন্তান কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলেই নবমী জব্দ। বামুনের

অভিশাপেই মানুষটা নাকি তার গেছে। কোন এক ব্রাহ্মণীর গা থেকে অলঙ্কার খুলে আনার সময় নাকি বলেছিল, ভেদ বমিতে যাবি। নবমী মনে করতে পারে সব। নবমী মনে করতে পারে সেও ছিল লুটের মাল। বখরায় বনছিল না বলে, তাকে নিয়ে পালাল। কত গ্রাম গঞ্জ রেল ইস্টিসানে তারা পড়ে থেকেছে। তার জন্য মানুষটা দেশ ছাড়া রাজ্য ছাড়া হয়ে গেল। শেষ বেলায় ইটের ভাটায়। কুলি কামিনের সর্দার।

পরী আগে আগে হাঁটছে। পিলু বুড়ির পাশে। সত্যি বেশ দূর মনে হল—তার বাড়ি ফিরতে হবে। রাত করে ফিরলেও কেউ বলার নেই। সে পার্টির কাজে কত জায়গায় যায় মিটিং মিছিল করতে। কত রাতে ফিরতে পারে না। খুব বেশি হলে সুহাসদাকে ফোন— এবং সুহাসদা জানে সে যেখানেই যাক, তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা পার্টির ক্যাডাররাই করে থাকে। আজ দাদু ক্ষোভে অভিমানে ফোনও না করতে পারে।

বাঁশঝাড়ের নিচ দিয়ে উঁচু নিচু পথ। সামনে ঢিবি। ঢিবির পাশে মাটি তোলায় মজা পুকুর। শাপলা শালুক, জলজ ঘাস, এবং কত সব বিচিত্র পাখি উড়ে যাচ্ছে বনটায়। পিলু কিংবা মায়ার যেন মনেই নেই তাদের দাদা নিখোঁজ। পরীদিকে নিয়ে বেড়াতে বের হয়ে সব দেখাচ্ছিল। ওটা—উ যে চালা ঘরটা দেখছ, ওখানে আমার পিসি বাড়ি করেছে। বাড়ি না বলে জঙ্গলের মধ্যে ঝুপড়ি বললেই হয়। গোপাল করের সীমানার শেষ হতেই বনজঙ্গলের শুরু। কাঁটা গাছ, খেজুরের বন, তাল গাছ, শিশুগাছ চারপাশে। বর্ষাকাল বলে ঝোপজঙ্গল নিবিড়।

পরী বলল, ঠিক রাস্তায় যাচ্ছিস তো !

পরী আসলে সেই রাস্তাটা চিনতে পারছে না। এমনও হতে পারে বর্ষাকাল বলে, বনজঙ্গল নিবিড় বলে সে যে ঠিক এই রাস্তায় এসেছিল মনে করতে পারছে না—কিংবা দিন দিন বাড়িঘরের সংখ্যা বাড়ায় জঙ্গলে যাবার রাস্তাটা জায়গা বদল করতে পারে। আসলে রাস্তা বলেও কিছু নেই। একটা গভীর সুমার বনে ঢুকে যাচ্ছে তারা। পরী বলল, নবমী, জঙ্গলে একা থাকতে কষ্ট হত না।

নবমী হাতজোড় করে তখন কার উদ্দেশে যে প্রণাম করত বোঝা ভার।

পিলু এগিয়ে গিয়ে বলল, জান পরীদি, নবমীর ছাগলের দুটো বাচ্চা। বেশি হলে জঙ্গলে রেখে আসত।

—জঙ্গলে কেন ?

—কী জানি কেন ! ওতো বলে ভূতেরা চাইত !

—ভূতেরা ছাগলের বাচ্চা চাইত। ভারি মজার ভূত তো !

নবমী লাঠি ঠুকে ঠুকে হাঁটছে। কাঁটা গাছে তার কাপড় জড়িয়ে গেলে পরী উবু হয়ে ছাড়িয়ে নিচ্ছে। কাঁটা গাছ বাঁচিয়ে যাবারও রাস্তা নেই।

পরী নবমীর কাপড় থেকে কাঁটা গাছ ছাড়িয়ে দেবার সময় শুনতে পেল, ভূত কেন হবে। ঠাকুর দেবতা !

পিলু বলল, আচ্ছা পরীদি, বনে ভূত ছাড়া কিছু থাকে ! ঠাকুর দেবতা থাকে বাড়িতে। নয় মন্দিরে।

নবমীর এক কথা, দা-ঠাকুর বনের দেবতা আছেন। জানেন না গো। একলা এতটা কাল থেইকে বুঝেছি।

নবমীর সব কথা স্পষ্ট নয়। শুধু জিভ নড়ে। আর কী বলে বোধ হয় পিলু ছাড়া আর কেউ বোঝে না। তবু বনটার কাছে এসে মনে হল পরীর, এক নারী তার যুবতী বয়সে এই জঙ্গলে উঠে এসেছিল। সঙ্গে তার মরদ। বাবুদের ইটের ভাটায় কাজ। শীত বর্ষায় গাছপালার মধ্যে থাকতে থাকতে নবমীর এই বন ছাড়া অন্য কোনো অস্তিত্ব নেই। তবু শেষ বয়সে মেসোমশাই তাকে আশ্রয় দিয়েছেন। শেয়ালে খাটাসে খেলে মানুষের অসম্মান। এখন সেই নবমী স্বামীর ভিটে দেখার জন্য পাগল। কে করবে এত !

বিলুদের বাড়িটায় হাঁস কবুতর খোঁড়া বাঁদর গোটা ছয়েক বিড়াল, দুটো কুকুর—কী না ছিল ! এখন প্রাণীর সংখ্যা কমে এসেছে। পরী মনে করে একজন উদ্বাস্তু মানুষের নানা সংস্কার গড়ে উঠতে পারে—কোন পাপে দেশ ছাড়া, এমন কোনো উচাটনে পড়েই হয়তো যাবতীয় প্রাণীজগত থেকে গাছপালার প্রতি এক অপত্য স্নেহ গড়ে উঠেছে মানুষটার। তা না হলে এই নবমীকে, যার তিনকাল গেছে, শেষ কালে যাবার সময়, তার জন্য ঘর তুলে দিয়েছে ! গীতা কিনে দিয়েছে ! পিলু নাকি মাঝে মাঝে রামায়ণ মহাভারতও পড়ে শোনায়। সব বিলুর কাছেই শোনা। বাড়িটা যে

চিড়িয়াখানা করে তুলছে তার বাবাটি—সেটাও ক্ষোভের বিষয়। পরী তার বাড়ি যে যায়, তাও বাবা মানুষটিকে দেখতে, তার চিড়িয়াখানা দেখতে। কিন্তু বিলু বোঝে না, এই বুড়ির তিনকুলে কেউ নেই—একজন মানুষের প্রাণ কত বড় হলে তাকে বসবাসের জায়গা করে দিতে পারে। নিজে উদ্বাস্তু না হলে, হয়তো নবমীর কথা মেসোমশায়ের মাথায়েই আসত না।

জঙ্গল থেকে নবমীকে তুলেও আনা হত না। রোগে ভোগে চারপাশে শুধু বনজঙ্গলের জীবজন্তুর সাড়া পাওয়া যেত। পিলুর খোটা দিয়ে কথা বলাটাও পরীর পছন্দ হচ্ছিল না। ডাকাতের বৌ ! তোর দাদা কত বড় ডাকাত জানিস। তার মান অপমানের জ্বালা কত জানিস ! সে কী-ভাবে আমাকে হেনস্থা করত জানিস !

কিছুই জানিস না।

ওদের দুই বন্ধুকে সাইকেলে আসতে দেখলেই বুক ধড়াস করে উঠত। সাইকেল থামিয়ে অপেক্ষা করতাম। কতদিন কতভাবে আমাকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছে। আমাকে দেখেই মুকুল সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াত। তোর দাদা থামত না। অবজ্ঞারও শেষ থাকে। সে সাইকেল নিয়ে ভাকুড়ির রাস্তায় উধাও হয়ে যেত।

কী যে খারাপ লাগত। বুঝবি না !

আমি কী মুকুলের সঙ্গে কথা বলার জন্য সাইকেল থেকে নেমেছিলাম। যার জন্য নামা তিনি হাওয়া।

কী ব্যাপার মুকুল !

খুব চটে আছে।

কেন ?

আর কেন। কলেজ ডিবেটে যেই তুমি উঠে দাঁড়ালে, ব্যস বাবু বললেন চল। আরে যাবে কী ! শোনো মিমি কী বলছে ! জোরজার করে বসিয়ে রাখলাম। কিন্তু যত তুমি যুক্তি দিয়ে বিজ্ঞান, প্রযুক্তির পক্ষে কথা বলছ, তত খেপে যাচ্ছে। যত তুমি হাততালি পাচ্ছ তত তার মুখ গোমড়া হয়ে যাচ্ছে। আর হঠাৎ জান দেখি পাশে নেই। কখন ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে। বাইরে বের হয়ে দেখছি গঙ্গার ধারে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বললাম, কী বিলু, এখানে ! পরী ডিবেটে কী তুখোড় যুক্তি দিয়ে

বলল, যদি শুনতে !

আরে রাখ ! বড়লোকের মাইয়া আমি চিনি। মুখে বড় বড় আদর্শের বুলি। আচ্ছা মুকুল, তুমি বিশ্বাস করতে পার এরা কখনও গরীবের দুঃখ বুঝতে পারে ! ভণ্ডামী না। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ। সব মানুষের জন্য আহার আশ্রয় উত্তাপ একমাত্র বিজ্ঞান ছাড়া সম্ভব নয়। মানুষের জন্য সমান সুযোগ—কখনও সম্ভব ! এরা যতদিন আছে শুধু ভণ্ডামির আশ্রয় নিয়ে গরীব মানুষকে প্রতারিত করবে। আগেকার জমিদাররা পুকুর কেটে, মন্দির বানিয়ে গরীব মানুষদের ধোঁকা দিয়ে গেছে, এরা এখন সমাজবাদের নামে ভাঁওতা দিচ্ছে। পরীর এটা প্রতারণা। তোর কী দরকার, হ্যাঁ কে তোকে বলেছে, মিটিং মিছিলে স্লোগান দিতে, এ-আজাদি ঝুটা হ্যায়।

মিমি জানে, একজন মেয়ের এই আত্মপ্রকাশ বিলুর একদম পছন্দ নয়। সে মিটিং মিছিলে গেলে বিলু ক্ষেপে যেত। পথ নাটিকায় অংশ নিয়েছে মিমি, শুনলেই ও রাস্তায় যেত না। সে মহেশ নাটকে আমিনার পার্ট করেছে, কলেজিয়েট স্কুলের দোতলার হলঘরে নাটক—সে কার্ড দিতে গিয়ে শুনছে, বিলু বাড়ি নেই। মাসিমা মেসোমশাইকে বলেছে, পিলুকে বলেছে, তোরা যাস। সে নাটকে অংশ নেবার আগে বারান্দায় বার বার ছুটে আসত, পিলু যদি আসে। আর কেউ না আসুক পিলু ঠিক আসবে। সেই পিলুর পর্যন্ত পাত্তা নেই। তার যে কী খারাপ লাগত ! পরে পিলু এলে মিমিও কথা বলত না।

পিলুর তখন এক কথা, কী করব দাদা বারণ করেছে।

মিমি কটাক্ষ করে বলত, একেবারে লক্ষ্মণ ভাই ! দাদা বারণ করল বলেই আসবি না। আমি কেউ না। দাদার কথাই বড় হল !

পিলু বলত, জাননা দাদা কী অশান্তি করতে পারে !

তোর দাদা স্বার্থপর। মজা দেখাচ্ছি।

সেও তখন ক্ষেপে যেত। আরও বেশি পার্টিঅফিস, আরও বেশি কলেজ ইউনিয়ান, সারাদিন টো টো করে ঘুরছে— আর মিমি জানে, বিলুটা চোরের মতো দূর থেকে সব দেখবে আর দিনরাত ফুঁসবে।

এটাও ডাকাতি। আমার ভাললাগা মন্দলাগার বিন্দু মাত্র দাম নেই। জবরদস্তি করে তুমি আমার প্রাণ ছিঁড়েখুঁড়ে খেতে চাও।

পিলু বলল, মিমিদি, আমরা এসে গেছি।

সে কেমন হুঁস ফিরে বলল, নবমী কোথায় !

—ঐ যে আসছে।

পরী দেখল, এক অশীতিপর বৃদ্ধা কেমন বেহুঁস হয়ে স্বামীর ভিটে দেখার জন্য উঠে আসছে।

গভীর বনজঙ্গলে মিমি কোনো ডেরা পর্যন্ত দেখতে পেল না। নবমী থাকত কোথায় ! কুল গাছের জঙ্গল পার হয়ে বড় বড় সব শিরীষ গাছ, আকন্দ গাছের ঝোপ, পিটুলি লতার সমারোহ। লাল বনজ ফল। এক ঝাঁক টিয়া পাখি ঠুকরে খাচ্ছে। মানুষজনের সাড়া পেয়েই তারা উড়াউড়ি শুরু করেছিল। কিন্তু মিমি বুঝল না, শুধু বনজঙ্গলেই স্বামীর ভিটে কী করে হতে পারে। থাকার মতো একটা ঝুপড়ি হলেও বসবাসের জন্য দরকার। সেটা কোথায় ?

পিলু সারা জঙ্গলটায় ঢুকে গিয়ে কেমন এক নেশার মধ্যে পড়ে গেছে। ঝোপে জঙ্গলে কোথাও যদি পাকা পেয়ারা পাওয়া যায়— এই জঙ্গলের মধ্যে কোথাও কোনো গোপন জায়গায় সেই পেয়ারা গাছটা—পিলু বোধহয় সেটাই খুঁজছে। সে গুড়ি মেরে ঢুকছে, মায়া ডাকছে, ছোড়দা তুই কোথায় ?

মিমি দাঁড়িয়ে আছে একা। ছোট্ট এক তৃণখণ্ডের চারপাশে এত বড় বড় গাছের বনরাজি লীলা দেখতে দেখতে সে কিছুটা অভিভূত। এর কোনো গোপন অভিলাষ আছে সে টের পায়। এখানে একজন পুরুষ তার প্রিয়তমা নারীকে নিয়ে থাকার মধ্যে কোনো গভীর আনন্দ খুঁজে পেতেই পারে। নবমীর স্বামী মানুষটাকে কেন জানি এই মুহূর্তে একজন স্বপ্নের মানুষ মনে হল। সেও হয়তো পালিয়ে কোথাও এখন গোপন করতে চায় নিজেকে। সে আর তার প্রিয় পুরুষ। আহার আশ্রয় উত্তাপের ব্যবস্থা থাকলে এর চেয়ে ভালবাসার জায়গা আর কোথায় থাকতে পারে সে জানে না।

এবং উলঙ্গ করে দেবার স্পৃহা নিরন্তর যে জন্মলাভ করে মনের মধ্যে, ডাকাত মানুষটি বনজঙ্গলে ঢুকে গিয়ে এটা বোধ হয় আরও বেশি টের পেয়েছিল। সে জায়গাটা ছেড়ে যেতে পারেনি। সারাদিন পরিশ্রমের পর

কী ঝড় বৃষ্টি, কী শীতের হাওয়ায় অথবা কোনো জ্যোৎস্না রাতে তার পরিভ্রমণ ছিল নবমীকে নিয়ে। প্রতিটি গাছের প্রতি তার মায়া জন্মে যেতেই পারে। এমনকী এই মুহূর্তে তার নিজেরও কেন যে মনে হচ্ছিল জায়গাটা ছেড়ে চলে গেলে সেও আর এক নবমী।

নবমী হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এসে মিমির পায়ের কাছে বসে পড়ল। কথা বলতে পারছে না।

মিমি বলল, কোথায় তোমার ঘর!

—ঐ যে হোথায়!

মিমি কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। শুধু একটা ভাঙ্গা ইট কাঠের আস্তানা। ভিতরে কিছু নেই। যে কোনো মুহূর্তে ওটা ধসে পড়তে পারে। পরিত্যক্ত কোনো আবাস হতে পারে এটা মিমি ভাবতেই পারে না। বাইরে থেকে মনে হয় শেওলা ধরা ইটের পাঁজা। তার ভিতর থেকে, ফাঁকফোঁকর থেকে বনজ উদ্ভিদের জন্ম হচ্ছে। এবং হেমন্তে শীতে কিংবা বর্ষায় এই ইটের পাঁজার মধ্যে শেকড় চালিয়ে বেঁচে থাকার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

—ওর ভিতর তুমি থাকতে!

নবমীর ফোকলা মুখে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। কিছু বলল না। সে তার আবাসের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। সামনে কবে কোন প্রচীনকালে মাটি তুলে ইট তৈরি হয়েছিল, তার খানাখন্দ এখনও বিদ্যমান। এই খানাখন্দের জলই ছিল নবমীর জীবনলাভের উপায়। তার রোগ শোক ব্যাধি এবং সুখ সব যাবার সময় জলে বিসর্জন দিয়ে গেছে।

কেন যে মিমির মনে হল, এমন সুন্দর জায়গা ছেড়ে কেউ যায়! মানুষটার স্মৃতি নবমীকে আটকে রাখতে পারল না। কারণ এই গভীর বনজঙ্গলের মধ্যে সব গাছপালার সঙ্গে একজন মানুষের নিরন্তর অবস্থান যে মরে যায়নি, নবমীর মুখ দেখে সে তা টের পাচ্ছিল।

মিমি না বলে পারল না, তোমার খারাপ লাগল না, চলে গেলে!

—সাধে কী গেছি মা ঠাকরুন!

—কী হয়েছিল!

—যখ।

—যখ!

—হ্যাঁ মা ঠাকরুন যখ এসে ঘোরাঘুরি করতে শুরু করল। কত ডাকতাম তার সাড়া পেতাম না। ডর হয়ে গেইছিল।

নবমী এ-সব কী বলছে! সারা জীবন এই বনজঙ্গলে বসবাসের পর যখ এসে তাড়া করল তাকে!

মিমি কিছুটা বিহ্বল হয়ে পড়ছে। যখ কেন, একজন অনাথ নারীর মধ্যে যখের ভয় কেন উদয় হল, সে তা বুঝতে পারছে না। ক্রমেই সে বিস্ময়ের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল।

সে বলল, তোমার মা বাবার কথা মনে পড়ে না!

—পড়ে।

—কষ্ট হয় না?

—না।

—কার কথা ভাবলে কষ্ট হয়।

—মরদের কথা।

—আর কারো কথা না!

—না আরও একজন আছেন। পিলু দাদা। আমার দা-ঠাকুর।

—তোমার দা-ঠাকুর। পিলু তো সেদিনের ছেলে।

—উ তো এসে আমাকে দেখে পালাল না।

—পালাবে কেন!

—আমি যে মানুষ না মিমিদি। আমার শনের মতো চুল, কংকালসার শরীর, উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াই, ডাইনি ছাড়া কেউ কিছু ভাবতে পারত না। জঙ্গলটায় ভয়ে লোক ঢুকত না। আমি তুকতাক করে ছাগল ভেড়া বানিয়ে রাখি। বিলুদাও রেগে যেত। দা-ঠাকুর আমার খোঁজ খবর নিতে এলেই বিলু দাদা তাড়া করত দা-ঠাকুরকে।

নবমী কত কথা বলে যাচ্ছে।

কবেকার সব স্মৃতি—ভাল করে বোধ হয় মনেও রাখতে পারেনি। তার অসংলগ্ন কথা এটা ওটা বাদ দিয়ে জুড়ে দিলে মনে হয়, আশ্চর্য এক গভীর প্রেম ছিল তার ডাকাত মানুষটির সঙ্গে।

সে বলল, তোমার বাবা কী করতেন!

—তিনি তো বড় সওদাগর ছিলেন। বয়েল গাড়ি ছেইল তিন গণ্ডা। বাজারে আড়ত—চাল, ডাল, তেলের। মোকাম। ঘর দরজার সীমাসংখ্যা নাই। বাড়িতে ডাকাত পড়ল। ছিনতাই হয়ে গেলাম।

পরী শুনছে। তার মধ্যে কোনো প্রাসাদের জলছবি ফুটে উঠছে। প্রশস্ত হলঘর— ঝাড় লণ্ঠন, চাকরবাকর, দাঁড়ে কাকাতুয়া এমন এক জলছবি ভেসে বেড়াতে থাকলে সে দেখতে পেল, সেখানে কে একজন লুণ্ঠন করার জন্য গোপনে ঢুকে গেছে। তার ভিতর হাহাকার বাজছে। কোথায় গেল বিলু। কোথায় গিয়ে উঠল। যেন সেই মৃত ডাকাত আবার অন্য ভূমিকায় এসে হাজির হয়েছে বনটায়। সেখানে সে কাউকে তুলে আনতে চায়—আবার অবাঞ্ছিত ভেবে নিজেকে কষ্ট দিতেও ভালবাসে।

নবমীর জীবন তাকে আজ অন্য কথা বলছে। তার মা-বাবার কথা মনে পড়ে, তবে কষ্ট হয় না। তার মোকামের কথা মনে পড়ে কিন্তু কোনো অসুবিধা বোধ করে না—দু তিন গণ্ডা বয়েল গাড়ির কথা মনে পড়ে—কিন্তু তাতে উঠে বসার কোনো আগ্রহ নেই তার। শুধু স্বামীর ভিটায় ঘুরে ফিরে চলে আস্তে চায়। পিলু মুখ করে। সে নিয়ে না এলে আজ এই তীর্থক্ষেত্রেরও খবর পেত না। তীর্থ তো মানুষ শান্তির জন্য করে। মানসিক শান্তি।

তখনই পিলু কোত্থেকে জঙ্গলের মধ্যে উঠে দাঁড়াল। ডাকল, পরীদি, এস।

—কেন।

—এস না।

মায়াও জঙ্গলের ডালাপালা সরিয়ে দূরে উঁকি দিল। —মিমিদি, এসে দেখ!

মিমির ইচ্ছে হচ্ছিল না নড়তে। এই বৃদ্ধার সঙ্গে তার কথা বলার আগ্রহ অসীম। সে বলল, যাচ্ছি। যাচ্ছি বলে আবার কথা শুরু করে দিল।

—তোমার মরদ কী মরে যখ হয়ে গেছিল।

—না না। মরদ আমার সে-রকম আদমি ছেল না।

পরী ঘাসের উপর বসে পড়েছে। দাঁড়িয়ে কথা বলতে অসুবিধা

হচ্ছিল। সব কথা নবমীর বুঝতেও পারছে না। সে নবমীর সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল।

দু'জন মুখোমুখি বসে।

একজনের উষাকাল, অন্যজনের সাঁজ লেগে গেছে।

পরীর কেন জানি নবমীর মুখ দেখতে দেখতে এমনই মনে হল। তার চেয়ে যে বেশি শ্রী ছিল না নবমীর শরীরে কে বলবে! সে নবমীকে বলল, ডাকাতের সঙ্গে ঘর করতে ভয় করত না।

নবমীর আবার সেই অপরূপ স্নিগ্ধ হাসি।

—যম। চোখের পাকে ভিরমি খেত। যমের মতো ডরাত।

বলে কী নবমী!

—তোমার চোখের পাকে ভিরমি খেত।

—হা সাচ বুলছি। মিছা বুলছি না। ডাকাতি ছেইড়ে দিল ডরে।

বলে কী!

—হ্যাঁ মিমিদি, আমি মিছা কখনও বুলি না।

মিমির কেন যে এত আগ্রহ নবমীর সব খোঁজ খবর নেবার। সে বলল, তোমার বাবা মাকে দেখতে ইচ্ছে হত না।

—হত। তবে মরদের ইজ্জত বড় না আমার ইচ্ছা বড় বুলেন! আমি তারে ছেইড়ে গেলে আতান্তরে পইড়ে যাবে না!

—সেই ভেবেই যাওনি।

লজ্জায় নবমী মাথায় আঁচল টেনে দিল।

এ কী পরীর সহসা আবার অশ্রুপাত কেন!

সে কথা বলতে পারছিল না। দু-হাটুর মধ্যে মুখ গুঁজে দিল। কোথায় খুঁজবে। সে জানে মেসোমশাই তার সান্ত্বনা পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছেন। বাড়ির সবাই। কিন্তু তাকে আশ্বস্ত করবে কে! বিলু যদি কোনো প্ল্যাটফরমে শুয়ে থাকে। সে তো নিজেকে কষ্ট দেবার জন্যই সংসারের স্বচ্ছলতা থেকে সরে গেল। এক দিকে তার নিজের আত্মপ্রকাশের তাড়না, অন্য দিকে পরীর মর্যাদা নষ্ট না হয় ভেবেই সে নিখোঁজ হয়ে গেল। তার হাত পা কাঁপছে। কেন যে দেখতে পাচ্ছে, প্রখর রোদে কেউ হেঁটে যাচ্ছে। মুখচোরা মানুষ। কাউকে নিজের কষ্টের কথা কখনও মুখ ফুটে

বলে না। তা-ছাড়া সে কলকাতার রাস্তাঘাটও ভাল চেনে না। ভিতরে এমন উতলা হয়ে পড়ল যে কিছুক্ষণ সে আর কোনো কথা বলতে পারল না।

নবমীর কথাতেই তার হুঁস ফিরে এল। নবমী তো জানে না, সেই শুধু ডাকাত নিয়ে ঘর করেনি। সব নারীকেই কোনো না কোনো ডাকাতের পাল্লায় শেষ পর্যন্ত পড়ে যেতে হয়।

—আমার নিবাসে চলেন।

নবমী লাঠি ভর করে উঠে দাঁড়াল।

পরী আর কী করে! নবমীর জীবন যে আগ্রহের মধ্যে ফেলে দিয়েছে, তাতে সে তাকে যেন আর বিন্দুমাত্র অবহেলা করতে পারে না। নবমী এতটা হেঁটে এসেও কোনো ক্লান্তি বোধ করছে না। সে এখন যেন পরীদিকে নিয়ে এই বনের মধ্যে ঢুকে গিয়ে কী মজা ছিল তার বেঁচে থাকার মধ্যে—দ্যাখ দ্যাখ, ঐ শিরীষের তলায় মরদ শুয়ে আছে, আমি জল নিয়ে গেছি, দ্যাখ দ্যাখ, হোথায় আড়াল হয়ে গেলে মরদ খোঁজাখুঁজি করত। জ্যোৎস্না রাতে ঘুরে বেড়াত গাছের ছায়ায়—আকাশ চাঁদমালা হয়ে বিরাজ করত—এমন ভুবনমোহিনী রূপ তার যেন বনজঙ্গলে না থাকলে ডাকাত মানুষটি টের পেত না।

ভিতরে ঢুকতে ভয় করছিল পরীর। যেন ইটের পাঁজা সব খুলে মাথার উপরে পড়বে। কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখল, মেঝে পাকা। দেয়ালে সিমেন্ট বালির পলেস্তারা, একটা বনজ গন্ধ ঘরে।

শেষ দিকে নবমী ছাগলের দুধ আর বনের ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকত।

পিলু বলেছে, বাসাটাই যেন বুড়িকে আগলে রাখত। হয়তো নবমী যখের ভয়ে পড়ে না গেলে স্বামীর ভিটে ছেড়ে যেতই না। জঙ্গলেরও থাকে প্রাণ কিংবা ভালবাসা, আর সব প্রাণীসকলের মতো নবমীও ছিল এই জঙ্গলের একজন। শেয়াল, বেজি, গো-সাপ, এমন কি সাপ খোপও ছিল তার প্রিয় সঙ্গী। আর যখন যে গাছে ফল হত, যেন নবমীর হয়ে তারা ঝরে পড়ত নিচে। পিলু গেলেই বাবাঠাকুরের জন্য ফল প্রণামী দিত। বেল, কয়েতবেল, তাল, নারকেল, আম, জাম, গোলাপজাম—কত না

বিচিত্র ফলের সমারোহ। কেউ জানতই না, এই কবরভূমি সংলগ্ন জমি সরকারের খাস, আর ভূত প্রেতের উপদ্রবে কত রাতে মানুষ তালকানা হয়ে গেছে, পথ হারিয়েছে—পথ হারালেই জঙ্গলের মধ্যে এলোপাতাড়ি ছুটতে গিয়ে দেখেছে, কোনো জরাগ্রস্ত উলঙ্গ রমণী গাছের নিচে বসে ঝিমুচ্ছে। এই বনজঙ্গলে ঘরবাড়ি ওঠার আগে অঞ্চলের মানুষেরা বনটায় ঢুকতেই সাহস পেত না। নবমী বলে এক যুবতী এই জঙ্গলে প্রেত হয়ে ঘুরে বেড়ায়, নবমীর বন বলে খ্যাত, তাকে কখনও দেখা যায়, কখনও দেখা যায় না, যে দেখে সেই দৌড়ায়। পিলুই আবিষ্কার করেছিল, বনের গভীরে এক বুড়ি থাকে। চাঁদের বুড়ির মতোই ছিল প্রথম দিকে রহস্যময়—কিন্তু পিলুর বেজায় সাহস—নবমীর বনের ভিতর দিয়ে শহর থেকে সর্টকাট একটা রাস্তা সে খুঁজে বের করেছিল। রেল-লাইন পার হয়ে, নীলকুঠির পরিত্যক্ত জঙ্গল পার হয়ে কবরখানা। কবরখানার ভিতর দিয়ে গেলেই নবমীর জঙ্গল। সেই কবে থেকে মানুষেরা নবমীর নিশীথে পরিভ্রমণকে কোনো ভৌতিক ক্রিয়াকাণ্ড ভেবে তার এলাকা পরিহার করে চলেছে। পিলু যেদিন তাকে দেখেছিল, তারও কম ভয় ছিল না। এক হাতে কী একটা ফল কুড়িয়ে লাঠি ভর করে এগিয়ে আসছে। দৌড়, দৌড়। এক দৌড়ে গাছপালা জঙ্গল ফেলে সে বাড়ি ফিরে নাকি বলেছিল, বাবা, বনটায় না—তারপর আর কিছু বলতে পারেনি।

বাবা পাটকাঠির বেড়া বাঁধছিলেন। শুনে বলেছিলেন, বনটায় কী!

পিলু চোখ বড় বড় করে বলেছিল, বনের অপদেবী।

—বনের অপদেবী!

—হ্যাঁ বাবা। লাঠি ঠুকে ঠুকে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—অপদেবী হবে কেন। চোখের বিভ্রম। অমন জঙ্গলে মানুষ আসবে কী করে। ভিতরে তো শুনেছি ঢোকাই যায় না। কেউ কেউ বলে নবমী বলে এক নারী এক কালে তার স্বামীকে নিয়ে থাকত। তারা তো সেই কবে হেজে মজে গেছে।

—না বাবা আছে। আমি দেখেছি।

বাবা হেসে বলেছিলেন, তুমি যে কত কিছু দেখতে পাও!

বাবার এই কথাটাই পিলুকে নাকি জেদ ধরিয়ে দিয়েছিল। শহর থেকে

ফেরার পথে সে বাদশাহী সড়ক দিয়ে আসত না। তার কাছে বাদশাহী সড়কটাও ছিল রহস্যময়—এই রাস্তায় সিরাজদৌল্লা ঘোড়া ছুটিয়ে গেছেন। পলাশীর মাঠে যুদ্ধ করতে। মোহনলাল মীরমদনের বাহিনী ছুটে চলেছে ঘোড়ায় চড়ে। মীরজাফর হাতীর পিঠে। দামামা বাজছে। সেই রাস্তার পাশে অলৌকিক বনটা তাকে তখন নাকি আরও বেশি টানত। নিঝুম গাছপালা থেকে কেবল পাতা ঝরছে। খস খস শব্দ শুনতে পায়। সর সর করে কারা যেন লুকিয়ে পড়ে তার পায়ের শব্দ পেলে। আর ডাহুক পাখির কলরব কিংবা বনটিয়ার ঝাঁক কোথাও। কোথাও মৌমাছির গুঞ্জন। পিলু ভিতরে ঢুকলে নাকি বিচিত্র কীট পতঙ্গের আওয়াজ পেত। তার মনে হত বনের ভিতর এক অদৃশ্য বাজনা বাজে।

পিলু সে তার পরীদিকে দেখলেই রাজ্যের সব খবর দেবার স্বভাব। বনটায় ঢুকলে তার গা নাকি ফুলে যেত। লোম খাড়া হয়ে উঠত। ঝুপ করে সামনে কে লাফিয়ে পড়ল, আরে বিশাল একটা হনুমান। দলে দলে হনুরা তাকে দেখলেই কেমন বিস্ময়ে নাকি তাকিয়ে থাকত। তাকে কিছু বলত না। দু-একটা যে তাকে দেখার জন্য একবারে গায়ের কাছে চলে আসত তাও সে বলেছে। পিলু হনু দেখলে সাহস পেত। এরা তো মানুষের সমগোত্র। তা-ছাড়া রামের সেতুবন্ধনে এরা ছিল বলেই রাক্ষসের দেশ থেকে সীতাকে রামচন্দ্র উদ্ধার করতে পেরেছিল। সেও নাকি দেখেছে, জঙ্গলের ভিতর মানুষ চলাচলের একটা গোপন পথ তৈরি হয়ে গেছে। খুব খেয়াল করলে ওটা বোঝা যেত। পথটা অনুসরণ করতে গিয়েই সে নবমীর এলাকায় ঢুকে তাকে দেখে ফেলেছিল।

তারপর পিলু এই রহস্য আবিষ্কারের জন্য কতবার যে বনটায় ঢুকে গেছে। না কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই। সে দেখতে পেত না নবমীকে। নবমী কী তখন মানুষের সাড়া পেলে ঝোপ জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ত!

সে তার খুশিমতো যে-সময়কার যে ফল, পেড়ে এনেছে। তালের দিনে তাল, এমন কী একবার জঙ্গলের মধ্যে একটা পাকা আনারসও সে খুঁজে পেয়েছিল!

কে গাছ রোপণ করে!

সে নারকেল নিয়ে আসত। ঝুনো নারকেল। এত গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটা নারকেল গাছ, একটা লিচু গাছ পর্যন্ত সে আবিষ্কার করেছিল!

কে রোপণ করে!

তখন পিলুরা রাজার বনজঙ্গল কিনে সব সাফ সোফ করছে। পুলিশ ক্যাম্প ছাড়া এক ক্রোশের মধ্যে লোকালয় বলতে কাশিমবাজার। সেখানকার সব মানুষেরাই এই গভীর বনের নানা উৎপাত নিয়ে এত ভীত ছিল যে সাঁজ লাগলে লাল সড়ক ধরে কেউ ফিরত না। হোতার সাঁকো পার হয়ে পাটের আড়ত, তারপর কিছু জরাজীর্ণ দালানকোঠা, বাঁ-দিকের রাস্তায় গেলে স্টেশন, সোজা গেলে রেল-লাইন পার হয়ে মিলের রাস্তা—সেই রাস্তায় রাতে মানুষজনের চলাচল টের পাওয়া যেত। পিলু এক দণ্ড বাড়ি থাকতে চাইত না—বাবার বাড়িঘরের চারপাশে কোথায় কী আছে খুঁজে বের করার আগ্রহ ছিল তার অনন্ত।

সেই অনন্ত আগ্রহই পিলুকে কখন যে বনের রাজা বানিয়ে ফেলেছিল। কিংবা নবমী যখন বলে, মাঝে মাঝে সে দেখতে পেত কেষ্টঠাকুরের লীলা—সে নাকি তখন জোড় হাত করে ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে পড়ত। তাকে দেখলে ঠাকুরের লীলা যদি আর দেখতে না পায়। এমন কী সে তার ছাগলটাকেও আড়াল করে রাখত।

পিলু গাছে উঠে ডালে বসে থাকত। কখনও গাছের ছায়ায় হেঁটে বেড়াত। বেত ঝোপ থেকে বেতের ডগা নিয়ে যেত। নারকেল পেলে নিয়ে যেত। ঠাকুর পুণ্যবান—ফলমূল তার প্রিয় হবে বেশি কী। একবার দেখেছিল, ঠাকুর ঝুড়ি এনে সারা দিনমান, বন আলু তোলার জন্য মাটি সরাচ্ছে। বিশাল বন-আলুটা ঝুড়িতে ধরছে না। ওটা মাথায় তুলতে বেজায় কষ্ট। সহ্য হয়নি। লাঠি ভর দিয়ে কাছে যেতেই পিলু চমকে উঠেছিল—আরে সেই বুড়িটা।

পিলুর আত্মারাম খাঁচা।

নবমী কী বুঝে বলেছিল, জঙ্গলটায় এলেন যখন কৃপা করে, একবার কপালে মাথা ঠেকাতে দিন গো দা-ঠাকুর।

পিলু দৌড় মারবে কিনা ভাবছিল।

নবমী তারপর সত্যি গড় হয়ে পায়ের কাছে একটা ঝুনো নারকেল

রেখে বলল, দা-ঠাকুর, মানুষ তো এ-বনে ঢোকে না।

পিলু বলেছিল, তুমি কে ? তুমি নবমী। লোকে বলে হেজে মজে গেছে ! মরে গেছ !

—আমি মরব কেন ! বেঁইচে আছি।

—লোকে যে বলে জঙ্গলে ডাইনি থাকে।

—না গো দা-ঠাকুর। আমার ঘরে আমি থাকি ! ডাইনি থাকবে কেন !

—তোমার ঘর আছে !

—আছে না। হুই উদিকটায়। আসেন দা-ঠাকুর। পায়ের ধূলা দিয়ে যান। আপনার পা-খান ছুঁতে দিন। বলেই সে গড় হয়েছিল ফের।

এর পর আর ভয় থাকে !

সে বলেছিল, তোমার ভয় করে না ! কোথায় তোমার ঘর।

—বনজঙ্গলে থাকলে দা-ঠাকুর ঘর লাগে না গো। সব কথা শুনি। জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই। উৎপাত করলে ভয় দেখাই।

—ভয় দেখাও মানে।

—এই আছি, এই নাই। বলেই জঙ্গলে সহসা অদৃশ্য নবমী।

—এই নবমী, তুমি কোথায়।

নবমী ঝুপ করে ভেসে উঠেছিল জঙ্গল থেকে।

নবমীর পেটে পেটে তবে এত দুষ্টুবুদ্ধি। বনটায় লোকজন ঢুকলে তার অধিকার খর্ব হয়ে যাবে। সে নিজেই নানা রঙ্গ তামাসায় মেতে গেছিল। গাছপালা এবং অরণ্যের মোহ তাকে এত দিন জড়িয়ে রেখেছিল। সেই নারী শেষে যখের ভয়ে উঠে গেল পিলুদের বাড়ি।

মৃন্ময়ীকে যত গভীর অরণ্যে নিয়ে যাচ্ছে তত তার সব মনে পড়ছিল। পিলুই তাকে নবমীর গল্প করত। পিলুর তো গাঁজাখুরি গল্পের শেষ নেই—এও হয়তো তেমনি। কিন্তু সত্যি তবে নবমী বুড়ি আছে। আছে তার গভীর অরণ্য আর অরণ্যের প্রতি টান। আজ নবমীর সঙ্গে না এলে সে টের পেত না, কোনো নারী একা স্বামীর স্মৃতি আগলে যে কোনো দুর্গম এলাকায় বসবাস করতে পারে।

বার বার বিলুর মুখ ভেসে উঠছে।

সে যে কী করবে !

কোথায় খোঁজ করবে তার।

বছর তিন আগেও একবার বিলু নিখোঁজ হয়ে গেছিল। তখনও মেসোমশাই ছিলেন নির্বিকার। গেছে—আবার ফিরে আসবে। মেসোমশাইয়ের এত আত্মবিশ্বাস—কী করে হয়—সে জানে দৈব বিশ্বাসই এর মূলে। তার কাছে মানুষের জন্য এমন কী প্রাণীজগত থেকে সব গাছপালা— কী নয়, এক অদৃশ্য শক্তির খেলা। সেখানে কোনো লড়ালড়ি চলে না।

পিলু গেল কোথায় !

মিমি ডাকল, এই পিলু, কোথায় গেলি।

অনেক দূর থেকে পিলু সাড়া দিচ্ছে।

ওরা ওখানটায় কী করছে ভাই বোনে !

বেলা পড়ে আসছে। গাছপালার ছায়া ক্রমে দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। এবং সে দেখল দূরবর্তী আকাশে বিশাল চাঁদের আবছা উপস্থিতি। পূর্ণিমা পার হয়ে গেছে, প্রতিপদ কিংবা দ্বিতীয়া—সাঁজ লেগে গেলেও ভয় পাবার কিছু নেই পিলু বোধ হয় জানে। পিলু কী এই অরণ্যের মধ্যে জ্যোৎস্নায় কখনও হাঁটাহাঁটি করেছে। তার ভয় না থাকারই কথা। কারণ নবমী বনটায় থাকলে—রাতের বেলায় সে অনায়াসেই ঘোরাঘুরি করতে পারে।

পরী বলল, তা হলে শেষে যখের তাড়া খেয়ে স্বামীর ভিটে ছাড়লে !

হা মিমিদি।

ওরা হাঁটছিল। নবমী তার স্বামীর স্মৃতি ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছে। নবমীর এই স্মৃতি ছাড়া আর কিছু যেন সম্বল নেই—যা সে মানুষের কাছে গর্ব করে বলতে পারে।

মিমি সব শুনছিল না। তাকে এখন আসলে যখ তাড়া করছে। সে বলল, নবমী, যখ তো গুপ্তধন পাহারা দেয়। তোমার ঘরে যখ কী করতে আসবে।

নবমীর কী মনে হতেই চুপ করে গেল। বাবাঠাকুর তো তাকে চোটপাট করেছে—কী তোমার ইট ক'খানা নিতে হবে। পারব না। কে নেবে ! তোমার ছাগল নিতে হবে, আবার কাঠের পেটি নিতে হবে। এত বাহানা চলবে না। যেতে হয় একা চল। ছাগলটা নিচ্ছি।

কিন্তু নবমীর সেই কড়জোড়ে প্রার্থনা, পেটিখান ফেইলে যাই কী করে।

দা-ঠাকুরও কম চোটপাট করেনি। এখন যদি খবরটা জানাজানি হয়ে যায় তবে বাবাঠাকুর গোসা করতে পারেন।—নবমী, আমরা কী তোমার গুপ্তধনের লোভে বাড়ি এনে তুলেছি। বল ! আমরা কী জানতাম, তুমি ইট ক'খানা পেটিতে পাহারা দিচ্ছ, গুপ্তধন আগলাচ্ছ আমরা জানতাম ! পিলু তো সব ক'টা ইট জলে ফেলে দিতে গেছিল ! দশ কান হলে ভাববে না, তোমার গুপ্তধনের খবর পেয়েই বাড়ি তুলে এনেছি, ঘর বানিয়ে দিয়েছি। পিলু মায়া প্রতিদানে তোমাকে বিকালে রামায়ণ মহাভারত পড়ে শোনায়। তোমার সেবা যত্ন সব গুপ্তধন পেয়েছি বলে ! বল, বল চুপ করে থাকলে কেন। বাবাঠাকুরের মুখ মনে পড়তেই নবমী কেমন চুপ করে গেল।

মিমি ফের বলল, যখ দেখেছ চোখে।

নবমী রা করছে না।

—যখ ঘোরাঘুরি করে টের পেতে কী করে !

নবমী রা করছে না।

—কী হল তোমার ! কথা বলছ না !

নবমীর হাত থেকে লাঠিটা পড়ে গেছে। মিমি ওটা তুলে দিল নবমীর হাতে। যখের কথা তুললেই রা করছে না। নবমীর মুখে সেই প্রসন্নতাও নেই।

নবমী যেন তার অজ্ঞাতেই সব ফাঁস করে দিচ্ছিল। কী যে হবে !

তখনই পিলু মায়া লতাপাতা ঝোপজঙ্গল সরিয়ে এদিকে ছুটে আসছে।—শিগগির মিমিদি এস, শিগগির।

—কেন !

—এসই না।

—কেন বলবি তো !

মায়ার মুখ প্রায় শুকিয়ে গেছে।

পিলু হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। নবমীকে বলল, বোস। আমরা আসছি।

—কোথায় হাত টেনে নিয়ে যাচ্ছিস।

সামনে বিশাল এলাকা নিয়ে কবরভূমি। মিনার, পরিত্যক্ত মসজিদ, কবরের উপর শ্বেতপাথরের ফলক, কোথাও গম্বুজ আর যতদূর চোখ যায় গাছপালা, পরে লাল সড়ক, একটা গরুর গাড়ি যাচ্ছে, ঝোপ জঙ্গলের ফাঁক থেকে তাও দেখা যায়।

জায়গায় জায়গায় শুধু ঘাস। তার উপর দিয়ে ওকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আর কিছু দূর গিয়েই সে যা দেখল, তার আত্মারাম খাঁচা। তাড়াতাড়ি পালাতে চাইল মিমি। পিলুর এই দুর্জয় সাহস তাকে কেমন বিচলিত করছে। সে কেবল বলছিল, সর্বনাশ !

—কিচ্ছু করবে না। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন !

বিশ পঁচিশ গজ দূরে সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখার জন্য পিলু তাকে এখানটায় এনে দাঁড় করিয়েছে। পিলুর ভয় ডর কম। তাই বলে কাল নিয়ে খেলা !

মিমি দু-জনের হাত ধরেই ছুটতে চাইল। কিন্তু পারল না।

পিলু কেবল বলছে, সাপের সং। কিচ্ছু করবে না। দেখ না। আমরা তো কখন থেকে দাঁড়িয়ে দেখছি। তুমি আসছ না !

যেন পিলু এই গভীর বনের জন্মরহস্য আবিষ্কারের নেশায় এতক্ষণ তার ছোট বোনকে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার পরীদি আসছে না দেখে সে ছুটে এসেছিল—না দেখে গেলে, পিলু ভাববে, পরীদি কী ভীতু—আলিসান দুই ভুজঙ্গ একে অপরকে জড়িয়ে লতার মতো বেয়ে উঠছে।

ভাদ্রের শেষ বেলা—মিষ্টি ঠাণ্ডা হাওয়া। গাছের ছায়ায় তারা দাঁড়িয়ে দেখছে। দেখতে দেখতে পরীর শরীর কেমন অবশ হয়ে যাচ্ছিল। সাপের এই সহবাস তাকে কোনো গভীর অতলে ডুবিয়ে দিচ্ছে। ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যের লীলায় সে অধীর। এখন ইচ্ছে করলেও সে নড়তে পারবে না। সে তাকিয়েই আছে। অবিরাম ঘাসের উপর বেয়ে বেয়ে দু'জনের এই সংলগ্ন হওয়া কোনো নারী পুরুষের উপগত হওয়ার মতো। ক্ষণিকের আশ্রয় উত্তাপ অথবা বিষবাষ্প থেকে আত্মরক্ষার সামিল—সাপ দুটো যাচ্ছে আবার ফিরে আসছে, দু'জনে মুখোমুখি ফনা তুলে দুলছে, ছোবল

দিচ্ছে ভূমগুলের হৃৎপিণ্ডে, তারপর আরও ঘন, আরও আরও যেন দুটো দড়ি পাক খেয়ে কিংবা ঘূর্ণিঝড়ের মতো বাতাসে ভর করে দাঁড়াচ্ছে—তারপর এক অপরূপ নৃত্য, ঘুরে ঘুরে দুলে দুলে নৃত্য। ফুলে ফুলে উঠছে শরীর। রোদে ঝকমক করছে তলপেট—এবং বরফের মতো সাদা পেটের সংলগ্ন স্থানে সহ-অবস্থান। শরীরে, রোমকূপে ঝড় তুলে দিচ্ছে।

বনভূমির কী যে থাকে সবুজ ঘ্রাণ, এই বেলায় বাতাসে তার ঘ্রাণ ছড়াচ্ছে। পরীর চোখ বিস্ফারিত। রোমকূপে ঝড়। আকাশ বাতাস থেকে দেবদূতের মতো উঠে আসছে মাত্র একটি মুখ—সে এতই নিষ্পাপ, সে এতই ভীরু, তার যেন জোরজার করারও ক্ষমতা নেই। এখন আর চোখের সামনে কোনো কালভূজঙ্গ দেখতে পাচ্ছে না—যেন দুই নরনারী সংলগ্ন হচ্ছে। সমর্পিত প্রাণ। সে আর স্থির থাকতে পারছে না। এবার পরী নিজেই কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল—ঠিক সাপের ভঙ্গিতে এই মোচড় তাকে পীড়নের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। চোখ লাল, কান গরম—এমন কী বালক-বালিকার সামনে দাঁড়িয়ে সঙ্গম দৃশ্য উপভোগ করা অশোভন—তা পর্যন্ত খেয়াল নেই। শরীরের গভীর অন্তস্থল থেকে দ্রুত কী সব সংকেত পাঠাচ্ছে হৃৎপিণ্ডে। ধক ধক করছে—বুক। সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। পিলুর কাঁধে ভর দিয়ে কোনো রকমে বলল, আমার কী হচ্ছে! জোর পাচ্ছি না। শিগগির আমাকে নিয়ে পালা। আমি না হলে মরে যাব।

পিলু বলল, ভয় পাচ্ছ কেন! ওরা এখন কারো ক্ষতি করবে না। আমি তো ঢিল ছুঁড়েছিলাম। ভ্রূক্ষেপ নেই। দেখ না কত ঢিল ছুঁড়েছি! আমাকে তাড়া করেছে? তবে ভয় পাবে কেন!

পিলু জানে না, পিলু বোঝে না, সরল বালক। সাপের সং দেখার সৌভাগ্য কম মানুষের হয়! সে বলল, জান পরীদি, ইস্ কী যে খারাপ লাগছে না। যাব দৌড়ে!

—কোথায় যাবি! কেমন ত্রাসের গলায় কথাটা বলল পরী।

—এক দৌড়ে যাব, এক দৌড়ে আসব। জান সাপের সং-এর উপর নতুন গামছা ফেলে দিলে পুণ্য হয়। গামছাটা ঘরে রাখলে যার যা মনোবাসনা পূর্ণ হয়!

—কে বলেছে!

—বাবা বলেছেন।

—যাবি! অতি কষ্টে কথাটা বলল। সারা শরীরে ঘুমের মতো কী এক জড়তা নেমে আসছে।

আর তখনই দেখল সেই কালান্তক যম প্রায় পাশাপাশি ঘাসের বুক বেয়ে পরিত্যক্ত মসজিদে ঢুকে গেল।

পরী আর পারল না। বসে পড়ল। তার পায়ে জোর নেই। দু-জংঘার মাঝে অবিরাম নদী প্রবাহ প্রবল প্রতাপে ভেসে যাচ্ছিল। পরী ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল কাত হয়ে। চোখ বুজে ফেলল। যেন সে এক গভীর অবশ অলস মুখর রাতে উপগত হবার পর তৃপ্তি নিয়ে শুয়ে আছে। সবাই চলে গেলেও তার কিছু আসে যায় না। রোমন্থনে সেই অমৃতের স্বাদ। সমুদ্র কত গভীর এবং তার সুখে অবগাহন পরীকে বড়ই কাতর করে রেখেছে। হুঁস নেই।

—পরীদি! কী হল তোমার! ও পরীদি, ওঠো। শরীর খারাপ লাগছে। ভয় কী। দেখ কিচ্ছু নেই। ও পরীদি, ওঠো।

পিলু দেখছে পরীদি চোখ মেলতে পারছে না। সে কেমন হায় হায় করে উঠল।

—নবমী, নবমী।

সে চিৎকার করে ডাকছে। নবমী বনজঙ্গলের ভেতর থেকে পিলুর ভয়ার্ত গলা পেয়ে ছুটে আসার চেষ্টা করছে। এসেই সে দেখছে পরীকে। শুয়ে, দিদিমণি অবশ।

পিলু সব বললে, নবমী ফোকলা দাঁতে হেসে ফেলল। পরীদিকে ডাকাতে ধরেছে গো। বসেন। ঠিক হয়ে যাবে।

জীবনের এই মাধুর্য পিলুর টের পাবার কথা নয়, নবমী জানে। নবমী তাকাল। এই অরণ্যের কোথায় সেই নিভৃত স্থান, যেখানে সে কত রাতে গাছের ছায়ায়, ঘাসের উপর ডাকাতের হাতে পড়ে উলঙ্গ হয়ে গেছে। সেই মাধুর্য জীবনে আর নেই—কিন্তু তার স্বাদ আজ যেন এক নারীর মধ্যে আবার খুঁজে পেয়েছে।

নবমী মাথার কাছে বসে হাত বুলিয়ে দিতে থাকল শরীরে। বেশবাস কিছুটা আলগা হয়ে গেছে। দুই বালক বালিকা কেমন তাজ্জব। পরীদির হিস্টিরিয়া আছে কিনা জানে না। পরীদিকে যদি ভূতে ধরে। এত সুন্দর পরীদিকে নিয়ে কবরখানায় ঢুকে সে ভাল কাজ করেনি! কী যে করবে!

পিলু প্রায় ছুটে যেতে যেতে বলল, নবমী, তুমি বোস। মায়া, তুই থাক। বাবাকে ডেকে আনছি।

পরীর হুঁস ফিরে আসছে!

ছিঃ ছিঃ সে এটা কী করে ফেলল!

নবমী ডাকছে, যাবেন না গো দাদাবাবু। সে বলল, সাপের সং দেখে ভিরমি খেয়েছে। হুঁস ফিরে এসেছে। যাবেন না!

পিলু চঞ্চল স্বভাবের। সে দৌড়ে এসে দেখল, পরীদি উঠে বসেছে। মাথার চুল ঠিক করছে হাত দিয়ে। আঁচল দিয়ে শরীর ঢেকে দিচ্ছে।

পিলু হাঁটু গেড়ে বসে বলল, হেঁটে যেতে পারবে তো।

কোটাল আসার মতো পরীর পরিতৃপ্ত মুখ। নিজেই উঠে দাঁড়াল। তারপর কী ভেবে আঁচল দিয়ে দ্রুত পেছনটা আড়াল দিল। একবার নিজেও পেছন দেখার চেষ্টা করল। আর তারপর পিলু না, আর ভাবতে পারে না! পরীদি ছুটছে। এক হাতে আঁচল কোমরের নিচে টেনে ধরে রেখেছে। আর ছুটছে। বাতাসে আঁচল উড়ে না যায়? পরীদি কোমরের পেছনে হাত রেখে শুধু বলছে, শিগগির আয়।

কেন এই চাঞ্চল্য পিলু বুঝল না।

নবমী গাছপালার মধ্যে দ্রুত হাঁটতে পারে না। তাকে ফেলে চলে যাওয়াও যায় না। পরী এটা বোঝে। সে শুধু বলল, আমি যাচ্ছি। তোরা আয়।

পিলু বলল, মায়া, তুই যা পরীদির সঙ্গে। জঙ্গলে হারিয়ে গেলে রাস্তা খুঁজে পাবে না।

মায়া তাড়াতাড়ি ছুটছে। তার ফ্রক উড়ছিল, বাতাসে পরীদি টানা ছুটছে না। ঝোপ জঙ্গল ভেঙে দ্রুত ছোটাও যায় না। কোথাও বসে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে, হাঁপাচ্ছে। আবার ছুটছে। আবার দাঁড়াচ্ছে। হাঁপাচ্ছে, আবার ছুটছে। মায়াও পরীদির সঙ্গে ছুটছে, দাঁড়াচ্ছে, হাঁপাচ্ছে।

মায়া পরীদির এই মতিগতির কিছু অর্থ ধরতে পারছে না। আর বাড়ি এসে অবাক, পরীদি কাউকে না বলেই মা-র শাড়ি সায়া ব্লাউজ নিয়ে কলতলায় চলে গেল। তাকে বলল, পাম্প কর। মগ ভর্তি জল তুলে চান করতে লাগল।

বাবা পরীদির ছুটে আসা দেখে কিঞ্চিৎ তাজ্জব হয়ে গেছিলেন। বললেন, ওরা কোথায়!

পরীদি জল ঢালতে ঢালতে বলল, ওরা আসছে।

নবমীও বাঁশতলা দিয়ে হেঁটে আসছে। বোধ হয় জোর ছিল না—হাঁটতে আর পারছিল না। পিলু ধরে নিয়ে আসছে। এক হাতে নবমীর লাঠি। ফিরে এসেই নবমী ধপাস করে বসে পড়ল। এক গ্লাস জল খেল আলগা করে। বাঁ-হাতে মুখ মুছে দেখল, পরীদি চান করে ভিজা কাপড়ে বিলুদার ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। কলতলায় কোনো আব্রু নেই—অসুবিধা। নবমী কেমন প্রসন্ন গলায় বলল, তীর্থ করে এলাম বাবাঠাকুর।

—ভাল করেছ। মনে জোর পাবে। মানুষের দাঁড়াবার জায়গা একটা বড় দরকার। যখন মনে হয় চলে যাবে। পিলু না যায় মায়াকে নিয়ে যাবে। নিয়ে যাবার লোকের তো অভাব নেই।

পরী ঘর থেকে সব শুনতে পাচ্ছিল। সে ভাল নেই। জঙ্গলে যা হল! সে কেমন আশ্চর্য এক সুখ, ঠিক সুখও বলা যায় না, জীবনে বেঁচে থাকার জন্য তারও যে দরকার ছিল নিজেকে আবিষ্কার করার। কোনো পুরুষই একজন নারীর জন্য অপেক্ষা করে না। নারীও না। তবু কেউ অদৃশ্য ছায়ার মতো তাকে অনুসরণ করে। সে তার পিছু হাঁটে। কোনো দুর্গম অঞ্চলই তার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।—বিশ্ব, তুমি কী চাও! আমাকে আর কত কষ্ট দিতে চাও। নিজে আগুনের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছ। আমি কী ভাল আছি! এ কী শাস্তির মধ্যে ফেললে। এখন আমি তোমাকে কোথায় খুঁজব!

সাড়া শব্দ না পেয়ে বাবা বললেন, দেখ তো পিলু, মিমি কী করছে!

দরজা বন্ধ! অনেকক্ষণ হয়ে গেল। সহসা তিনি ত্রাসের মুখে পড়ে গিয়েই বলেছেন, হয়তো নিজেই দৌড়ে যেতেন। কেন এই ত্রাস তাঁর!

পিলু দরজা ঠেলে অবাক।

পরীদি দাদার বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সন্তর্পণে দরজা ভেজিয়ে সে বাবার কাছে ছুটে গেল। কানে কানে ফিস ফিস করে বলল, বাবা, পরীদি না কান্নাকাটি করছে। বাবা বিস্ময়ের গলায় বললেন, কাঁদছে! কেন! শরীর খারাপ! তারপরই কী ভেবে বাবা মাথা নিচু করে বসে থাকলেন। নিখোঁজ পুত্রের কথা ভেবে তাঁরও মন খারাপ হয়ে গেল। তবু তিনি উঠে দাঁড়ালেন। পরীকে সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। আজ তিনি কেন জানি পরীকে শুধু রায় বাহাদুরের নাতিন ভাবতে পারলেন না। সে এ-পরিবারের একজন। দরজার কাছে গিয়ে বাবা তাঁর ইদানীংকার আপ্তবাক্যটি বললেন, বুঝলে মিমি, কেহ আত্মাকে আশ্চর্য মনে করে—কেহ বা আশ্চর্যবৎ বলিয়া আত্মাকে বর্ণনা করে। আবার কেহ আশ্চর্য বলিয়া শোনে। কিন্তু ইহার বিষয় শুনেও কেহ ইহাকে বোঝে না। কান্নাকাটি কর না। সে ঠিক ফিরে আসবে।

পিলু শুনছিল। সে জানে বাবা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার সময় সাধু বাক্য বলেন।

॥ আট ॥

সকালে পিলু আবার সাইকেল নিয়ে বের হয়ে গেল। দাদা না থাকায় সাইকেলটা নিয়ে সে যখন তখন বের হয়ে যেতে পারে। যখন খুশি ফিরতে পারে। মা বাবা কোনো ফরমাস করলে তার মেজাজ তখন আর অপ্রসন্ন হয় না। বরং সে অপেক্ষায় থাকে বাবা কী ফরমাস করবেন, মা-র কী দরকার। কাল সকালে দাদাকে বিছানায় না দেখে সাইকেলে প্রায় সারাটা দুপুর কাটিয়েছে। এটা যে কী মজা, যেন সে ঘোড়ায় চড়ে বসে—তারপর বাদশাহী সড়কে উঠে এদিক ওদিক—যেদিকে দু চোখ যায় ইচ্ছে করলে চলে যেতে পারে। দাদা বাড়ি না থাকায় ধমক খাবার ভয় নেই। বাবার ধারণা শরীরের মতো যন্ত্রও বসিয়ে রাখলে ঘুণে ধরে। ঘুণে ধরা ঠিক না। চলুক, যতক্ষণ চলছে চলতে দাও। থাকলেই বিগড়াবার ভয় থাকে।

কাল সারাটা দিন পরীদিকে নিয়েই কেটে গেল।

আজ বাকি কাজগুলো তার করা দরকার। যেমন মুকুলদাকে খবর দিতে হবে। যদি কোনো নতুন খবর টবর পেয়ে যায়।

সে সড়কে উঠে গেলেই হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দেয়। ট্রাক সামনে। যমদূত আসছে। সে রাস্তা ছাড়ছে না। ট্রাক, বাস দেখলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। বাপের জায়গা! নিশ্চিন্তে সাইকেল চালাতে না পারলে মেজাজ আসে না। সে সড়ক ছাড়ছে না। ট্রাকটাকে পাকা রাস্তার বাইরে নামিয়ে ছাড়বে। সে পারেও। দুরন্তগতিতে ট্রাকের সামনে হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে দেয়। বোঝো মজা! নামিয়ে ছাড়লাম। শালা শূয়োরের বাচ্চা আমি! বোঝো এবার। সেও তখন মরিয়া হয়ে যায়। সেও ছেড়ে কথা বলে না। কোনো কারণে গরু ছাগল আনতে গেলে কিংবা সড়কের ধারে একা থাকলে ট্রাক দেখলেই একটা ইট কুড়িয়ে নেয়। ধাঁই করে মারে—তারপর মাঠ ধরে দৌড় আর দৌড়। ট্রাক থামতে থামতে বনজঙ্গলের আড়ালে পড়ে যায় সে।

বাবা একদিন শুনে তেড়ে এসেছিলেন—খুবই বিপজ্জনক খেলা। বার বার নিষেধ করছি! কখন কী হয় বলা যায়! সাইকেল নিয়ে তো বের হও না, বাড়ির আত্মাটি হাতে নিয়ে বের হও। সময় মতো না ফিরলে কত দুশ্চিন্তা তুমি বোঝো!

এটা ঠিক। এটা তারও হয়। দাদা সাইকেলে শহরে যেত। ফিরত বেশ রাত করে। অপরূপার কত কাজ! তা ছাড়া পুলিশ মাঠে দাদাদের আড্ডা। কী নিয়ে যে দাদারা এত কথা বলে বোঝে না। ফিরতে একটু বেশি রাত হলেই সে সড়কের কাছে হাঁটতে হাঁটতে চলে যায়। দুশ্চিন্তা। দাদার বেলায় এটা হত, নিজের বেলায় কেন তা হয় না বোঝে না।

আসলে ফাঁক পেলেই তার যে সাইকেল চড়ার নেশায় পেয়ে বসে। নেশা বিষম বস্তু। বাবা বলেছেন, একবার ধরলে আগাপাশতলা ছাল চামড়া ছাড়িয়ে নেয়। তারও নেবে হয়তো। কে জানে—ট্রাকের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া, যেই টের পাচ্ছে, পেছনে ট্রাকের হর্ন, তার যে কী হয়—পাল্লা। চালাও পানসি রানাঘাট—কে পারে দেখ! কে আগে যায় দ্যাখ! হলে কী হবে শেষ পর্যন্ত তাকে রাস্তা ছেড়ে দিতেই হয়। ক্ষোভে

জ্বালায় তখন তার একমাত্র ঢিল সম্বল। ট্রাক দেখলেই—মারো শালাকে। কে তার শত্রু ঠিক অবশ্য জানে না। ট্রাক না ট্রাকের ড্রাইভার। বড় হয়ে সে ভেবেছে, ট্রাকের ড্রাইভার হবে। এই একটা বাসনা আছে। কত কত সব দূর গঞ্জ, পাহাড়তলি কিংবা শস্যক্ষেত্র পার হয়ে চলে যাবে। নদী, মাঠ, সেতু পার হয়ে সে চলে যাবে। সটান বসে থাকবে—হু হু করা বাতাসে তার চুল উড়বে—স্বপ্ন স্বপ্ন। সাইকেলেরই এত নেশা, আর ট্রাকের নেশা কী না জানি!

—আরে পিলু যে! আয় আয়।

মুকুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছিল। মুখে পেস্টের ফেনা। কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছে বলে, মুখের ফেনা ফেলে এগিয়ে গেল, গেট খুলে দিল। ভোর রাতে বেশ বৃষ্টি হয়েছে। বাগানের এখানে সেখানে জল জমে আছে। শরতের আকাশ, সকালের রোদ, রাস্তার কদমগাছ—এবং চারপাশে সবুজের সমারোহে সে বেশ প্রসন্ন। শারদীয়া অপরূপার প্রস্তুতি চলছে। বিল্ব হয়তো কোনো জরুরী খবর দিয়ে পাঠিয়েছে পিলুকে। ওর তো মতিস্থির নেই। হয়তো কোনো লেখা পছন্দ, প্রেসে দিয়ে দাও, আবার বিকেলে ডাকে আসা কোনো লেখা পছন্দ হয়ে গেল তো ওটা ফেরত নিয়ে এস। পরে দেখা যাবে। তা ছাড়া সে যেমন ভাল নেই—চৈতালি কলকাতায় চলে যাবার পর থেকেই মনমরা, আসলে তো কাগজটা বের করার এত উৎসাহ একমাত্র চৈতালি—সেই নেই। বিল্বও ভাল নেই। মিমির সঙ্গে বোধ হয় বড় রকমের খিটিমিটি বাধিয়ে বসে আছে। কিছুতো বলে না! চাপা স্বভাবের।

পিলু বলল, জানো মুকুলদা, দাদা না কোথায় চলে গেছে। তোমাকে কোনো খবর দিয়ে গেছে! কোথায় উঠবে! কোথায় থাকবে।

—বলিস কী! কোথায় গেল বলে যায়নি! কখন গেল। ওর যে কী হয় মাঝে মাঝে বুঝি না।

—না। একটা····বলেই থেমে গেল। বাবা কেন যে চিঠির কথা ফাঁস হতে দিতে চান না, সে বুঝছে না। চিঠিতে দাদা পরীদিকে জড়িয়ে গেছে। খুবই নাকি কেলেঙ্কারি ব্যাপার। দাদা তো খারাপ কিছু লেখেনি! তার জন্য পরীদিকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে—খারাপ তো লাগবেই!

মুকুল বলল, ভিতরে আয়। কবে গেল! কখন গেল। তুই চুপ করে আছিস কেন। মেসোমশাই থানায় গেছে। এতো ভারি ঝামেলা। কত কাজ অপরূপার। না বলে না কয়ে ফের উধাও। পাগলা আছে সত্যি। কোথায় যাবে কিছুই বলে যায়নি!

—না।

তার এই প্রিয় বন্ধুটি হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যেতেই মুকুল কেমন কষ্টের মধ্যে পড়ে গেল। দু'জনের দুটো প্রিয় সাইকেল, দুই প্রিয় নারী. কবিতা চর্চা, অর্থাৎ স্বপ্ন, বিল্ব এ-শহর ছেড়ে চলে যেতে পারল! দু দিন দেখা নেই, ভাবছিল, আজই যাবে, কেন যে এটা হয়! যেন কোনো এক আশ্চর্য অমোঘ বন্ধন তৈরি হয়ে গেছে. দু'জনের মধ্যে। দু'জনে কতদিন চুপচাপ বসে থেকেছে বড় মাঠে—কিংবা রেশম কুটির জঙ্গলে ঢুকে গাছপালার ছায়ায় হেঁটে গেছে—দু হাত উপরে তুলে গলা ছেড়ে কবিতা আবৃত্তি, নিজেদের কবিতা পাঠ আর কখনও সাঁ সাঁ করে সাইকেল চালিয়ে নির্জন রাস্তার কোনো বৃক্ষের ছায়া পেতে কী যে ভাল লাগত! সে নেই, নিখোঁজ। বুকটা কেমন তোলপাড় করে উঠল।

—বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল!

—না।

তারপরই মনে হল সে মিছে কথা বলছে। বাবার হম্বিতম্বি—গায়ে হাত, দেবীর গায়ে হাত, এ-যে মহাপাপ।

কিন্তু পাপের কথাতো বলা যায় না। তবে যে সে তার বাবাকেই ছোট করে ফেলবে। দাদাকেও। সে বলল, না মানে, মন কষাকষি চলছে। তুমি তো জান, বাবা চান, দাদা কলেজের পড়াটা শেষ করুক।

—মিমি জানে।

—হ্যাঁ কাল তো মিমিদি আমাদের বাড়িতেই ছিল।

—তোদের বাড়িতে!

পিলু বুঝল না, এতে দোষের কী আছে। তারা গরীব। কিন্তু পরীদি তো গরীব লোকদের খুব ভালবাসে। বাড়িতে কত দাপট তাও সে অনেকবার দেখেছে। বাবা কত করে বললেন, তা হয় না, তুমি বাড়ি যাও। পিলু সঙ্গে যাবে। অবশ্য পিলু জানে, পরীদি একাই যেতে পারে।

তার দুর্জয় সাহস। দু-চারজন ছেলে তার সঙ্গে সব সময় ঘোরে। পার্টি করলে তো ঘুরতেই হবে! আর দাদা কেন পরীদির এটা বিলাসিতা ভাবে সে বোঝে না।

—সকালে বাড়ি চলে গেল। পিলু বলল।

—চল তো পরীর কাছে। বলেই মুকুল সাইকেল বের করতে গেলে বলল, পরীদিকে পাবে না। কোথায় যেন যাবে। নাটক আছে।

মুকুল জানে পরী মহেশ নাটকে আমিনার পার্ট করে। কিছুদিন তাকে বাড়ি থেকে বের হতে দেওয়া হচ্ছিল না তাও জানে। পরেশ চন্দ্রের সঙ্গে কথা চলছে। বিবাহযোগ্যা কন্যা হলে যা হয়। পরী থম মেরে বাড়িতে এতদিন বসেছিল, ভাবলেই অবাক লাগে। তবে পরী আবার বিদ্রোহ করেছে!

মুকুল কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। সে গেট থেকেই দৌড়ে গেল। বারান্দায় উঠে বলল, বৌদি, শুনছ বিলুর কাণ্ড! সে নাকি আবার ভেগেছে।

বৌদি দাদা সবাই বের হয়ে দেখল, পিলু তখনও বাগানের বাইরে দাঁড়িয়ে।

—ভিতরে এস। ওখানে কেন!

—না আমি যাই। সুধীনদা, নিখিলদাকে যদি কিছু বলে যায়।

মুকুল সাইকেল বের করছে। সে কেমন জলে পড়ে গেছে। পিলুর কথাও মনে নেই। কিন্তু পিলু বলছে, যদি কিছু বলে যায়। তাকে কিছু বলল না, পরীকেও না, নিখিল, সুধীনদাদের কিছু বলে যাবে বিল্ব সেই ছেলেই না। সে বলল, দাঁড়া আমি যাচ্ছি।

বৌদি বলল, কিছু মুখে না দিয়েই বের হচ্ছ! পিলুকে ডাক। কিছু খেয়ে বের হও। তারপর পিলুকে ডেকে বলল, ভিতরে এসে বস।

মুকুল জানে কিছু খেয়ে বের না হলে অশান্তি হবে। সে পিলুকে ডেকে বলল, আয়। ভেবে আর কী হবে। সেবারেও তো কোন এক ছোড়দির খবর পেয়ে মেসোমশাই বিল্বকে আনতে চলে গেলেন। ওর যা স্বভাব, আর যা চেহারা, ছোড়দির অভাব হবে না। অযথা মাথা গরম করে লাভ নেই।

পিলু তবু ঢুকল না। কারণ সে তো ভাল নেই—যতই এই শহর, এবং বোর্স্টাল জেলের পাঁচিল পার হয়ে রেললাইন পার হয়ে কোনো দিগন্ত প্রসারিত মাঠে পড়ে যেতে ভাল লাগুক, সাইকেলের নেশা থাকুক—তবু দাদার জন্য আজ কেন জানি তার কিছু ভাল লাগছে না।

—না আমি যাই।

পিলু কিছুতেই ভিতরে ঢুকল না। দাদা যা মানুষ, যদি কোনো প্ল্যাটফরমে শুয়ে থাকে! যদি স্টেশনে এসে মনে হয়—কাজ ঠিক করেনি। বাড়ির কথা, পিলুর কথা ভাবলে, দাদা শেষে কোথাও নাও যেতে পারে। লজ্জায় বাড়ি যেতে পারছে না। চিঠি লিখে গিয়ে কে আর ফিরে আসে। মান মর্যাদা যে খোয়া যায়।

তার হাতে এত কাজ মুকুলদার সঙ্গে আটকে গেলে আজকের দিনটাও নষ্ট হবে। কোথায় কোথায় চলে যাবে—তারপর তার আসল কাজটাই হবে না।

সে সাইকেলে যাচ্ছিল। কে পেছন ডাকল, এই পিলু, তোর দাদা নাকি নিখোঁজ।

পিলুর মাথা গরম হয়ে যায়। কলোনির সুবোধদা। কাপড়ের দোকান আছে মীরা সিনেমার সামনে। দোকান খুলতে যাচ্ছে। খবরটা তবে বাতাসের আগে উড়ছে। নিখিলদা বাড়ি নেই। সুধীনদা বাজারে গেছে। তবে মুকুলদা ঠিক খবর দেবে। তার এখন সবচেয়ে জরুরী কাজ, দুটো স্টেশনে খোঁজ নেওয়া। পিলু বাবার নির্বিকার স্বভাব পায়নি। সে তার আয়ত্তের মধ্যে যতদিন দাদা না ফিরছে, ঘোরাঘুরি চালিয়ে যাবে। আর তার কেন যে মনে হয় স্টেশনে গেলেই দেখতে পাবে দাদা দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে। কেউ ডেকে না নিয়ে গেলে দাদা যেতে পারছে না। সে গেলেই দাদা সুটকেস হাতে নিয়ে তার সঙ্গে রওনা হবে।

এই সব আশার কুহকেই সেবারে সে রোজ গাড়ি এলেই স্টেশনের রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। এটা এত বেশি প্রচার হয়ে গেছিল, যে দাদা সেই ভয়ে চিঠিতে লিখে গেছে, আমার জন্য স্টেশনে গিয়ে বসে থাকিস না। মন মানে! দাদা তুই এত অবুঝ। তুই বুঝিস না, বাড়ি না থাকলে আমাদের কত কষ্ট!

সে স্টেশনে সাইকেল তুলে প্ল্যাটফরম ধরে হেঁটে গেল। যাত্রীর ভিড়। সাড়ে আটটার ট্রেন ধরবে। আর সঙ্গে সঙ্গে কেন যে মনে হয় দূরে ঐতো দাদা দাঁড়িয়ে আছে। বড় বড় চুল, পাজামা পাঞ্জাবি পরা। সে কাছে গিয়ে নিরাশ হয়ে গেল। দাদা না। সে উঁকি দিয়ে মুখ দেখতে দাদার বয়সী মানুষটা বলল, খোকা, কিছু বলবে।

সে লজ্জায় পড়ে যায়। ওয়েটিং রুমের ভিতরে উঁকি দিল, তারপর মনে হল বাথরুমে থাকে যদি। সে বাথরুমের দরজা ঠেলেও দেখল। এটা তার কেন হয়! দাদা না ফিরে আসা পর্যন্ত সে বাড়িতে এক দণ্ড স্থির হয়ে বসে থাকতে পারবে না। দাদা যদি না ফেরে কলকাতায় চলে যাবে। কলকাতায় গিয়ে খুঁজতে শুরু করবে। কিন্তু সে তো খুব বেশিদূর যায়নি। বাবা মাঝে মাঝে এ-দেশে এসে উধাও হয়ে যেতেন। তাঁর শিষ্য যজমান আত্মীয়রা কে কোথায় এসে উঠল খোঁজ-খবর নিতেন। বাবার তখন ট্রেনে টিকিট লাগত না। উদ্বাস্তু মানুষের কাছ থেকে নাকি রেলের ভাড়া নিতে নেই—এই বিশ্বাসে বাবা সহজেই এখানে সেখানে চলে যেতে পারতেন। দু দিনের বলে বের হতেন—ফিরতেন পক্ষকাল পরে। মা-র চোপার ভয়ে বলতেন, আর বল না নেত্যকালীর সঙ্গে ট্রেনে দেখা। সেই ধরে নিয়ে গেল। কিছুতেই ছাড়ল না।

মাধবদির সরকাররা পূর্বস্থলীতে এসে উঠেছে। নিয়ে গেল। সেখান থেকে রানাঘাটে। হাইজাদির রাঘব ঘোষ কিছুতেই ছাড়ল না, এত বড় পাবদা মাছ, প্রায় হাতখানা মেলে ধরে পাবদা মাছের সাইজ দেখিয়েছিলেন। এ-দেশে এসে এত বড় পাবদা বাবা খাননি, পাবদা মাছ খাবার লোভেই বাবা বিনা নোটিসে থেকে গেলেন। পিলুর তখন মনে হয় বাবাও কম পেটুক না। তারপর বাবার এক কথা, রাঘব খুব আদর যত্ন করল। ছেড়ে আসি কী করে! এমন সব গল্প শুনে পিলুর মনে হয়েছিল বড় হলে রানাঘাটে যাবে। অনেক স্টেশনে কিংবা প্ল্যাটফরমে রাত্রিবাস তাদের তখন নিত্যকার ব্যাপার। সে বিছানায় উঠে বসেছিল তড়াক করে। বাবার পাবদা মাছ খাওয়ার গল্প শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে গেছিল। নানা জায়গায় তারা ঘুরেছে এ-দেশে এসে। রানাঘাট জায়গাটায় গেছে কিনা বলতেই বাবার জবাব, যাবে না কেন! দেশভাগের পর রানাঘাটের উপর

দিয়েই তো এলাম।

তারপরের প্রশ্ন ছিল, রানাঘাট কতদূর! সেখানে আবার যাওয়া যাবে কি না। কারণ গেলে বড় পাবদা মাছের ঝোল খাওয়া যাবে—পিলুর এমন মনে হত। রানাঘাটে তার যাওয়া হয়নি। তিন চার বছরের উপর বনজঙ্গলে বাড়ি ঘর করার পর কোথাও আর যাওয়া যায় তাও সে এখন বিশ্বাস করে না। কিন্তু বড় হয়ে রানাঘাট যাবে—এই উচ্চাশা সে এখনও পোষণ করে থাকে। বেগে সাইকেল চালাবার সময় তার লক্ষ, চালাও পানসি রানাঘাট।

যার রানাঘাটই যাওয়া হয়নি, তার পক্ষে যে কলকাতা জায়গাটা খুব নিরাপদ নয় পিলু তা বোঝে। সে কাশিমবাজার স্টেশনে ঢুকে খুঁজল। কোনো বেঞ্চিতে কেউ শুয়ে নেই। সব ফাঁকা। কেবল কিছু কাক দূরের গো-ডাউনের মাথায় কা কা করছে। সে কেমন ক্রমশই নিরাশ হয়ে যেতে থাকল। বাকি থাকল, সেই রেশম কুটির জঙ্গল। যেখানে দাদা সারাদিন একটা গাছের নিচে শুয়েছিল। পরীদিকে মেরে আসার পর জঙ্গলটায় ঢুকে গাছের ছায়ায় চুপচাপ শুয়েছিল।

গেল সার্টিফিকেটের নকল নিয়ে রায়বাহাদুরের কাছে,সে যে শেষে পরীদিকে মেরে ক্ষোভে দুঃখে জঙ্গলের মধ্যে চিত হয়ে ঘাসের মধ্যে শুয়ে থাকতে পারে কে বিশ্বাস করবে! পরীদিকে মেরে ভাল ছিল না দাদা। দাদার কষ্ট সেও কম বোঝে না। তাই বলে সারাবেলা জঙ্গলের মধ্যে শুয়ে থাকতে পারলি! তবু যে সুমতি হয়েছিল ফেরার, না হলেই বা কী করা যেত!

রেশম কুটির জঙ্গলটা রেললাইনের ধারে। সে সেখানে ঢুকে গেল। বড় বড় তুঁত গাছ, নীল সবুজ ঘন পাতা—রেশম গুটির চাষ। কেমন গভীর নির্জন। গাছপালার মধ্যে কোনো মানুষের সাড়া পাওয়া যায় না। তবু তার সেই আশা কুহকিনী—সে খুঁজতে খুঁজতে এক সময় চিৎকার করে উঠল, দাদারে!

না কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

সে গলা ফাটিয়ে ডাকছে, দাদারে!

না কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

গাছের পাতা হাওয়ায় দুলছে। ঘাসের মধ্যে কীটপতঙ্গ ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা ট্রেন চলে গেল হুইসিল দিতে দিতে। মালগাড়ির ঝকর ঝকর শব্দ। দূরে বাসের হর্ন বাজছে। সব এত স্বাভাবিক, সব এত ঠিকঠাক, কেবল তাদের সংসারেই দাদা আগুন ধরিয়ে কোথায় যে চলে গেল! তার চোখ ফেটে জল আসছিল। সে ছাড়বে না, দাদা কী ভেবেছে! তারা মানুষ না, যা খুশি করবে! সে কেমন পাগলের মতো কেবল ডাকছে, দাদারে তুই ফিরে আয়। পরীদি তোর বিছানায় শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। তোর কোনো মায়া দয়া নেই!

পিলু আসলে দাদার এই নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার বিষয়টিতে এর চেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে না। তার আর কোনো বড় সম্বল নেই। জ্বালা ক্ষোভের যন্ত্রণায় সে ছটফট করছিল। গাছের ডাল ভাঙছে। যা কিছু সামনে পড়ছে লাথি মেরে সরিয়ে দিচ্ছে। কাক পক্ষী দেখলে তেড়ে যাচ্ছে। তোমরা সুখে থাকবে, উড়বে—ওড়া বের করছি! আর ডাকছে, দাদারে। যেন সে দাদাকে পেলে চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যেত। গাছের ডাল ভেঙে ভাল ছিল না, পাখি তাড়িয়ে ভাল ছিল না—কী ভাবে যে সে খুঁজে বের করবে!

একদিন বাবা বললেন, বুঝলে পিলু, এটাই তোমার কুঅভ্যাস! ভাল না। দাদা ফিরে আসছে না কেন, আমরা কী করব! তোমার খোঁজার পালা শুরু হয়ে গেল। সে কী এখানে আছে! জান পৃথিবীটা কত বড়। এর সাতটা সমুদ্র আছে জান। হিমালয় পাহাড় আছে জান। পাঁচটা মহাদেশ আছে জান? কুমেরু সুমেরু আছে জান! এত বড় পৃথিবীতে লুকিয়ে থাকলে কার বাপের সাধ্যি আছে খুঁজে বের করে। সে নিজে ফিরে না এলে আমরা কিছু করতে পারি না। খোঁজাখুজি সার। তুমি বের হবে না বলে দিলাম।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! সে সাইকেল বের করছে। সে রেলে চড়ে বেলডাঙ্গা পর্যন্ত গেছে। ভাবদা সারগাছি গেছে। সে এই করতে করতে কতদূর যেতে পারে একবার দেখবে। কলকাতায় দরকার হলে চলে যাবে।

মায়া বলল, ছোড়দা, যাস না। সারাদিন টো টো করে কোথায় ঘুরিস,

খাওয়া নেই, তোর ঘুরতে ভাল লাগে। কষ্ট হয় না। মা কাঁদে। আমার কপাল এই। যাও একটু সুখের মুখ দেখলাম, এখন দু'জনের এই মতিগতি। কেউ কারো কথা শোনে না।

পিলু যাবেই—অগত্যা বাবা আর কী করেন। তাঁর আজ দুর্গা নবমীর ব্রত আছে। সকাল সকাল বের হতে হবে। স্নানে যাবার উদ্যোগ করছিলেন। তখনই পিলুর মাথায় ক্যাড়া উঠে গেল। সাইকেল বের করতে দেখেই বললেন, আরে তোমার দাদা তো লিখে গেছে, তোমার এই কুঅভ্যাসটি তো তার জানা। তোমাকে কী লিখে গেছে বল!

যেন বাবা পড়া ধরছেন।

—বল কী লিখে গেছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কেন!

পিলু ছাত্রের মতো বলল, স্টেশনে গিয়ে বসে থাকতে নিষেধ করে গেছে।

—তবে!

খড়মের একটা বাউলি খুলে গেছে। বাবা খড়মে বাউলি ঠুকে দিতে দিতে বললেন, তবে, বুঝছ সে তোমার মতো অবিবেচক নয়। সে জানে। তাকে নিয়ে তোমার মাথার ক্যাড়া উঠে যাবে। এ-জন্যই নিজের হস্তাক্ষরে লিখে গেছে। গুরুত্বটা তার বুঝছ।

পিলু জানে তাদের বাবা এ-রকমেরই। ঈশ্বর ছাড়া তাঁর কোনো আর অবলম্বন নেই। না হলে সেই কবে এমন একটা বনজঙ্গলে ঘরবাড়ি বানাতে সাহস পায়! ছেলেপুলে নিয়ে সংসার। সামনে পুলিশ ক্যাম্প ছাড়া আর কোনো মানুষের বসতি নেই। রাতের বেলা বেড়ার পাশে শেয়াল খাটাস ঘুরে যায়। পুলিশ ক্যাম্পও খুব কাছে না। পানীয় জল আছে, প্রথমেই সেদিন বাবার ছিল এই আপ্ত বাক্যটি সার। কপর্দকশূন্য মানুষের যা হয়ে থাকে।

—এখানে ঠাকুরকর্তা ঘরবাড়ি বানালেন। কে আছে?

—কেন, ঈশ্বর আছেন। গাছপালা বনজঙ্গল আছে। মাটি আছে। আকাশ আছে। হাওয়া আছে! কী নেই বল?

সুতরাং এমন বাবার সঙ্গে তার তর্ক করা বৃথা। সে সকালে এক পেট পান্তা খেয়ে আর কোনো কথা না বলে সাইকেলে বের হয়ে গেল!

বাবা বিরক্তিতে বললেন, যত্তসব ! খুঁজবেন ! বের কর খুঁজে । দেখি কী করতে পার । আরে তাঁর মর্জি না হলে, তোমার দাদা নিখোঁজ হন ! তাঁর মর্জি না হলে, তিনি কখনও ফিরে আসেন ।

॥ নয় ॥

একদিন মিমি হুড়মুড় করে রিকসা থেকে নেমে ছুটে এল । পিলু দেখছে, পরীদি কেমন রোগা হয়ে গেছে । এর আগেও প্রায়ই খবর নিয়ে গেছে, আর খবর শুনে মুখ কালো হয়ে গেছে । ফেরেনি । কোনো চিঠিও দেয়নি । পরীদি তারপরও বলেছে, মেসোমশাই ভাববেন না—আমি বসে নেই । লোক লাগিয়েছি । কলকাতায় আমাদের কাগজের জানাশোনা ছেলেরা আছে । ওদের সব খুলে লিখেছি । সম্ভবত বিলু কলকাতায় গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে । কফি-হাউসে খোঁজখবর নিতে বলেছি । খবর পেলেই চলে যাব ।

—তুমি চলে যাবে কেন ? তোমার দাদামশাই দুঃখ পাবেন । আমিই যাব । কলকাতায় আমি গেছি ! ভাববে না, আমি কলকাতা চিনি না ।

মা রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছিল । মা বাবার কথা সহ্য করতে পারে না । বলল, তুমি গেলেই হয়েছে । বাবা বেটা দু'জনকে খুঁজতেই তখন আবার পরীকে হন্যে হয়ে ছুটতে হবে ।

বাবা পরীদির দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, বোঝো ! অর্থাৎ যেন বলা, বোঝো আমি কী শান্তিতে আছি ।

সেই পরীদি রিকসা থেকে লাফ দিয়ে নামল । শাড়ি সামলে এক হাতে ছুটে আসছে জাম গাছতলার নিচ দিয়ে । পিলু বারান্দায় মাদুর পেতে পড়ছিল । আর তখনই রিকসার ঘণ্টি বাজছে—সে দেখছে রাস্তা থেকে পরীদি ছুটতে ছুটতে আসছে । মুখে চোখে উত্তেজনা ! পরীদি কী দাদার খোঁজ পেয়েছে ! সে চিৎকার করে বলল, বাবা, পরীদি আসছে । সেও পরীদির কাছে ছুটে গেল । দাদার নিশ্চয়ই কোনো খবর আছে । না হলে এ-ভাবে কেউ ছুটে আসে না । আর তখনই মাথায় পোকা ঢুকে যায়, কোনো খারাপ খবর নয় তো ! পরীদি তো সাইকেলে আসে । কলোনিতে

পরীদি পার্টির কাজ করে বেড়ায় । কার লোন বের হয়নি, কার ক্যাসডোল মেলেনি, কারা নতুন এল—বসতি কোথায় দেওয়া হবে, নানা কাজে এখন পরীদি আসে । মাঝে মাঝে রাত বেশি হয়ে গেলে শহরে ফেরে না । দাদার ঘরে মায়াকে নিয়ে শোয় । সে তখন বাবার পাশে শুয়ে থাকে । সেই পরীদি রিকসাতে । খুবই জরুরী খবর—না হলে রিকসায় যেন আসতে পারে না । কাছে আসতেই দেখল পরীদির চোখে মুখে উচ্ছ্বাস । ঠিক এই পরীদিকে পিলু চেনে না ।

সে বলল, পরীদি তুমি ! দাদার কোনো খবর পেলে !

পরীদি বলল, পেয়েছি !

পিলু লাট্টুর মতো পাক খেয়ে বলল, মা মা, বাবা বাবা—মায়া, দাদার খোঁজ পাওয়া গেছে ।

বাবা ঘরে কিছু করছিলেন । করছিলেনটা আর কী ! তাঁর গামছায় বাঁধা একটা পুঁটুলি ঘাঁটছিলেন । যখন তিনি অথৈ জলে পড়ে যান, ওটা করে থাকেন । পুঁটুলিতে থাকে, একখানা বছরকার পঞ্জিকা, তালপাতায় লেখা চণ্ডী স্তোত্র, কালীকা স্তোত্র আর বনজ গাছ, লতাপাতার গুণাগুণ ব্যাখ্যা করা বটতলার একটা বই । এরই ভিতর তাঁর টাকা পয়সা গোঁজা থাকে । কেউ ধরলেই ক্ষিপ্ত হয়ে যান । পুঁটুলিটা তাকের উপর তুলে রাখেন । বাড়িতে ঠাকুর দেবতার পর এই পুঁটুলিটাই বাবার সব । সিঁদুর মাখা একটি রূপোর টাকাও থাকে পুঁটুলিতে । টাকাটা বাবা দেশ থেকে সঙ্গে এনেছিলেন । মাথা নেড়া একজন মানুষের মুণ্ডুর ছাপ টাকাতে । সে একবার গোপনে খুলে টাকাটা হাতে নিয়ে দেখেছিল । তাঁর পোঁটলা কেউ ধরলেই টের পান । সেদিন বাবা অগ্নিশর্মা । আমার গৃহলক্ষ্মীর উপর কার দয়া হল ! কে ধরেছে ! কেউ স্বীকার করে না । সেও না । বাবা গজগজ করছিলেন, আমার জিনিসে কার যে এত দরকার বুঝি না । কিছুই খোয়া যায়নি—কিন্তু কিছুতেই বাবার মেজাজ প্রসন্ন করা গেল না সেদিন ।

দাদার খবর পাওয়া গেছে শুনে সবাই ছুটে বের হয়ে এলেও বাবাকে দেখা গেল না । নবমী পর্যন্ত তার ঘর থেকে বড় দাদাঠাকুরের খবর পাওয়া গেছে শুনে গুড়ি মেরে বের হয়ে এসেছিল । কেবল বাবার সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না ।

পরীদি ছুটে এসে বারান্দায় বসে গেল। মাটি উঁচু করে ঘরের বারান্দা। গোবরজলে নিকানো। পরীদির এই স্বভাব। মাটির দাওয়ায় বসলে আকাশের নক্ষত্র নাকি খুব কাছে দেখা যায়। অদ্ভুত সব কথা। পরীদি উচ্ছ্বাসে প্রায় যেন ভেঙে পড়ছে। মায়ার দিকে তাকিয়ে বলল, এক গ্লাস জল খাওয়া।

কী খবর কিছুই বলছে না। কোথায় আছে দাদা তাও বলছে না। পিলু অপেক্ষা করছে উঠোনে—দাদা কোথায় আছে ? কবে আসবে ? কিন্তু পরীদি কিছুই বলছে না দাদার সম্পর্কে। এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, মেসোমশাই বাড়ি নেই !

ভিতর থেকে গলা পাওয়া গেল, যাই। দেখ না, কোথায় যে রাখলাম !

খুবই জরুরী কিছু বাবা হারিয়ে বসে আছেন। দাদার খবরের চেয়েও জরুরী বিষয় বাবার এখন আর কী থাকতে পারে পিলু বুঝতে পারছে না। এমন কী অমূল্য নিধি তাঁর হারিয়েছে যা দাদার খবরের চেয়ে বড়। পরীদি যতবারই এ-বাড়িতে এসেছে—দেখেছে বাবা ঝোপজঙ্গলে গাছের পরিচর্যায় ব্যস্ত। আগাছা সাফ করছেন। গাছের গোড়ায় মাটি দিচ্ছেন। সেই বাবা ঘরের ভেতর কী করছেন এখন কে জানে ! পরীদিও হয়েছে, বাবা বারান্দায় এসে না বসলে যেন কোনো খবরই কাউকে দিয়ে লাভ নেই।

পিলু আর পারল না, দাদা তোমাকে চিঠি দিয়েছে !

—তোর দাদাকে এই চিনলি এত দিনে ! সে চিঠি দেবে ! তা-হলেই হয়েছে। সে চিঠি দেবার লোক !

—তবে কে জানাল ? তুমি কলকাতায় গেছিলে !

পার্টির মিছিল গেলে পরীদি কলকাতায় যায়। পরীদি এমনিতেও যেতে পারে। কলকাতায় তার কাকা থাকেন, এক পিসি থাকেন। তাদের বাড়ি ঘর আছে। বেড়াতে যেতে পারে। কত কারণেই পরীদি যখন তখন কলকাতায় চলে যেতে পারে। এক-দু'দিন থেকে ফিরে আসতে পারে—যদি সেখানে দাদার কোনো খবর পায়।

পরীদির হাতে সুন্দর মলাটের একটা বই। এত যত্ন করে রেখেছে, এবং কোলের উপর রেখে যাতে ভাঁজটাজ না পড়ে—যেন এই বইটা পরীদির কাছে বাবার চণ্ডীস্তোত্রের চেয়ে মূল্যবান। কারণ পরীদি আঁচল দিয়ে এরই

মধ্যে মলাটে ধুলোবালি না লাগে, মুছে আবার নিজের মুখ মুছল। কার্তিকের বেলা—রোদের তাপ কম—তবু পরীদি ঘামছে। এত যত্নে আলতো করে আঁচলে বই-এর মলাট কেউ মুছে দেয় পিলু এই প্রথম টের পেল। নিজের মুখের চেয়েও দামি বই-এর সুন্দর মলাট—এমনই মনে হল তার।

বাবা বিরক্ত হয়ে যেন এবার বাইরে বেরিয়ে এলেন। বারান্দায় জলচৌকিতে বসে বললেন, তা হলে শ্রীমানের খবর পাওয়া গেল। আসার কোনো খবর দেয়নি !

পরী বলল, না তা দেয়নি। খবর পাওয়া যায়নি !

—কী বলছ। এই যে পিলু গলা ফাটিয়ে বলল, দাদার খবর পাওয়া গেছে।

—তা পাওয়া গেছে।

—সেটা কী ! বাবার কেমন তিক্ত গলা।

পরী যত্ন করে পত্রিকাটা এগিয়ে দিল।

—এটা কী ! এটা দিয়ে আমি কী করব !

—কলকাতার খুব বড় কাগজ।

—কী আছে এতে ?

—বিলুর কবিতা !

—কবিতা !

পিলু দেখল বাবার চোখ মুখ কুঁচকে গেছে। পরীদি কী যে করবে ভেবে পাচ্ছে না। এটা তাহলে বই নয়। পত্রিকা। দাদার কোনো খবর নেই। দাদার কবিতা ছাপা হয়েছে। বাবা যে এতে কুপিত হবেন বোঝাই যায়। দাদার কবিতা নিয়ে বাবার যত ক্ষোভ। গোল্লায় গেল। মাথায় পোকা ঢুকে গেছে। আখের সর্বনাশ !

পরীদি বলল, বিলুর কবিতা ছাপা হয়েছে।

—ছাপা হয়েছে তো আমি কী করব।

—কত নামি কাগজ মেসোমশাই—।

যেন পরীদির এত দিনে জীবন সার্থক। পিলু জানে, দাদা বন্ধুদের গর্ব—দাদা পরীদির আবিষ্কার। পরীদিই ব্লেকমেল করে দাদাকে দিয়ে

কবিতা লিখিয়েছে। ব্লেকমেল কী পিলু জানে না। তবু দাদার সঙ্গে ঝগড়া বেঁধে গেলে, পরীদি চেঁচিয়ে বলত, আমি তোমাকে কবিতা লেখার জন্য ব্লেকমেল করেছি বিলু!

—হ্যাঁ করেছ। কে যায় ও-পথে। তুমিই তো অযথা ভয় দেখালে। প্রতারণা করেছ।

—প্রতারণা! তোমার সঙ্গে!

—কার সঙ্গে তবে! তোমার তো একজনই আছে প্রতারণা করার লোক। তুমি বলনি, বলে দেব।

—কী বলে দেব বলেছি।

—আমি যে গ্যারেজ থেকে গোবিন্দের কৌটা ভেঙে কুড়ি টাকা নিয়ে সেবারে পালিয়েছিলাম বলনি! বলনি, আমি চোর। চোরকে কালীমন্দিরের পুরোহিত করা যায় না!

—হায় সর্বনাশ, বিলু তোমার মিছে কথা বলতে জিভে আটকাল না! চোর না বললে তো মন্দিরে পুরুতগিরি করতে। সব তো ঠিক হয়ে গেছিল। দাদামশাই, তোমার মানুকাকা, মেসোমশাই মিলে ঠিকই করে ফেলেছিল! মনে নেই ছুটে এসেছিলে, পরী আমাকে বাঁচাও। বাবার যা কাছাখোলা অবস্থা রাজি হয়ে যাবেন। বর্তে যাবেন। রক্ষা কর। কার্তিক ঠাকুরকে তখন কে রক্ষা করেছিল!

—না বলিনি।

—মিছে কথা বলবে না। একদম বলবে না। বলনি, এখন আমি কী করব পরী!

পিলু দেখেছে, দাদা আর কথা বলতে পারত না। একেবারে চুপ করে যেত।

পরীদি তখনও গজ গজ করছে—আমি যত নষ্টের গোড়া না! নষ্ট করেছি। ঠিক করেছি। আরও করব। পারলে একশবার করব। হাজারবার করব। কবিতা লিখতে বললে মানুষকে নষ্ট করা হয়!

দাদা আবার গর্জে উঠত, চুপ। তুমি বলনি, বিলু, সব করব। কবিতা লেখ। তুমি পারবে। তোমার চোখ মুখ বলছে পারবে। তোমার ভিতর জ্বালা আছে। অনুভূতি আছে স্বপ্ন আছে। তুমি পারবে। কলেজ

ম্যাগাজিনের কবিতাটা দাও। তবেই দাদামশাইকে বলব, বিলুটা একটা চোর। গ্যারেজ থেকে টাকা চুরি করে একবার পালিয়েছিল। একটা চোরকে বাবাঠাকুরের জায়গায় বসাবে! ভাল দেখাবে! তোমার মা কালী রাগ করবেন না! কী বলনি! বল চুপ করে থাকলে কেন। কে আমাকে রাস্তায় টেনে নামিয়েছিল!

পরীদি বলত, বেশ করেছি। তোমার সর্বনাশ আমি চাই। আঃ কী কবিতা! পরী আমার সর্বনাশ। আর কোনো লাইন খুঁজে পেলেন না তিনি!

দাদার ঘরে কথা কাটাকাটি হচ্ছে। বাইরে থেকে কেউ শুনছে। সেই পরীদি কত উচ্ছ্বাস নিয়ে এসেছে, আর বাবা কেবল বসে বসে তামাক টানছেন। পত্রিকাটা মাটিতে পড়ে আছে। পরীদির কাছে যা গৌরবের, বাবার কাছে বোধ হয় তা খুবই অগৌরবের।

হঠাৎ বাবা প্রশ্ন করলেন, এতে কী পেট ভরে মা! এই যে চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে বাবু দুম করে অন্তর্ধান করলেন, ফল ভাল হবে! কবিতা লিখলে পেট ভরবে!

পরীদি মাথা নিচু করে বসে আছে।

মা বললেন, মিমি, বিলুর কোনো খবর নেই কাগজে!

—আছে মাসিমা। কাগজটাইতো খবর। বিলু কী সুন্দর কবিতা লিখেছে। বলে সে মা-র কাছে কাগজটা নিয়ে গেল।

বাবা বললেন, ওনি তো কবিতা বোঝেন।

আসলে ঠেস দিয়ে কথা।

পরীদি বলল, কবিতা বোঝার জন্য কেউ লেখে না মেসোমশাই। পড়ে ভাল লেগে যায়। দূরের কথা বলে। স্বপ্নের কথা বলে। বেঁচে থাকার কথা বলে। কত পাঠক পড়বে। নাম জানবে। আমি তো আর কিছু চাইনি।

বাবা ফের বললেন, বেশ ছিল, এখানে কাগজ নিয়ে পড়েছিল। কুকর্ম সুকর্ম তার এখানকার বন্ধুরাই সামলাত। এত বড় শহরে গিয়ে কবিতা লিখে শেষে দেশসুদ্ধু যজালি!

পরী মেশোমশাইকে জানে। তার প্রতি মেসোমশাইয়ের এ-কারণে চাপা

ক্ষোভও আছে। যদি তিনি পাতা উল্টে দেখেন, পড়েন। কত বড় বড় কবির পাশে তার কবিতা ছাপা হয়েছে। না দেখলে বুঝবেন কী করে! তারপরই মনে হল, মানুষের দারিদ্র্য অনেক কিছু বোধ হয় হরণ করে নেয়। ঝড়, জল, অন্ন চিন্তা, মুষ্টি নির্ভর জীবন কোন কবিকেই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে দেয় না। তিনি দেখলেও এর গাম্ভীর্য কিংবা গুরুত্ব টের পাবেন না। পরীর নিজেরই ইচ্ছে হল একবার সবটা পড়ে শোনায়।

তখনই পিলু বলল, তুমি যে বললে, দাদার খবর আছে, এই খবর!

—হ্যাঁ। তোর দাদা কলকাতায় গা ঢাকা দিয়ে আছে। কতদিন থাকতে পারে দেখব। পত্রিকা অফিসে গেলেই ওর খবর পাওয়া যাবে। কফি-হাউসে গেলে পাওয়া যাবে। কবিরা মুখচোরা স্বভাবের হয়। আড়ালে আবডালে থাকতে ভালবাসে জানি। তবু সে ভালই আছে। এর চেয়ে বড় খবর আর কী পেতে চাস বুঝি না। আমার কাছে এর চেয়ে বিলুর আর অন্য কোনো বড় খবর যে থাকতে পারে না। কথা বলতে বলতে মিমির গলা ধরে এল।

এতে বাবার বোধ হয় সামান্য লেগেছে। বললেন, দেখি। তারপর তিনি পাতা উল্টাতে থাকলেন কাগজটার।

॥ দশ ॥

সকাল থেকেই পিলুর মেজাজ খারাপ।

—না পারব না। কিচ্ছু করতে পারব না। আমাকে কিছু বলবে না। যাব বাড়ি থেকে বের হয়ে বুঝবে মজা।

—যা না যা, একটাতো গেছে। তুইও যা। কে থাকতে বলেছে! আমি তোদের কে?

আসলে পিলু বুঝতে পারে, দাদা বাড়ি নেই বলে মা-র চণ্ডীপাঠ শুরু হয়ে গেছে। শীতের সময়। বাড়িতে পিঠে পুলি হবে। চাল বাটা থেকে, মাষকলাই কিছুই বাদ যায়নি। ঠাকুরের ভোগ হবে। অথচ দাদাটা বাড়ি নেই। ইট কাটার আগে ঠাকুরকে সামান্য অন্নভোগ।

সব ঝক্কি তার উপর।

—এই পিলু!

বাবা হয়তো ডাকলেন।

—যাতো সনতকে বলবি সের খানেক আরও খেজুরের গুড় দিতে। তোর মা-তো রণচণ্ডী হয়ে আছেন। ঠাকুরের ভোগ কার জন্য! আরে বোঝো না, কার জন্য! মানত করেছি যখন, দিতেই হয়। দেখি ঠাকুর কী করেন। কতটা খেলাতে পারেন। ইটের ভাটা হবে বোঝো না!

সকাল থেকেই শুরু হয়েছিল। এক দণ্ড সে বসে থাকতে পারছে না। পরীক্ষা হয়ে গেছে। স্কুল নেই। বাড়িতে আর কে আছে ছোটাছুটি করবে! দাদাটি তো মজা করছেন। কার সঙ্গে পিলু তাও বোঝে না। পরীদি দাদার কবিতা নিয়েই হৈচৈ করছে। আরে মানুষটা কোথায় আছে কী খাচ্ছে, কারো মাথায় নেই। এক ফোঁটা জল গড়িয়ে খেতে জানে না, তার কি না এত মেজাজ!

সকালে উঠেই একবার যেতে হয়েছে নিবারণ দাসের আড়তে। ইট কাটা হবে। মাটি তোলার কাজের জন্য জনমজুর নিবারণ দাসেরই ঠিক করে দেবার কথা। বাবার বড় যজমান। বিষয়ী মানুষ। সব কাজে কর্মে নিবারণ দাসকে খবর দাও। কোথায় ইটের ভাটা হবে, জনমজুর কত লাগবে, সাঁওতাল মেঝেন হলে ভাল হয়—সবই নিবারণ দাসের পরামর্শে। দাদা বাড়ি নেই—অথচ বাবা কোনো কাজই করতে বাকি রাখছেন না। বাবা যে ভাল নেই সে বোঝে! যখন ভাল নেই, তখন আর ইটের ভাটা পুড়িয়ে কী হবে! কার জন্য মন্দির! নবমীর গুপ্তধন বাবা পেয়ে সব ঠাকুরের নামে করে রাখছেন। জমি জমা বাড়ি ঘর সব। নবমীর ইচ্ছে, জঙ্গলে তার স্বামীর ভিটায় যেন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা হয়।

পিলু আজ নবমী বুড়ির উপরও ক্ষেপে আছে। কৈ যখন তুলে আনি তখন তো এত বায়না ছিল না! যখের ভয়! যখ ঢুকে গেছে! যখন ঢুকে গেছে তো আমরা কী করব!

—আমারে তুইলে নিয়ে যান। বাবাঠাকুরের পায়ের কাছে পড়ে থাকব। রেইতের বেলা ঘুমাতে পারি না। যখ ঢুকে যায়। লাঠি নিয়া তাড়া করি। যায় না। ঘুইরে ফিইরে আসে।

ঝামেলা কী একটা! বুড়িটা বনজঙ্গলে থাকে, কে খেতে দেয়। কে

জল দেয়। নবমীর জন্য তার কষ্ট এত কেন সে বোঝে না। বাবা যদি রাজি না হয়। তবে সে দেখেছে, বাবা অনাথ মানুষ দেখলেই কেমন ঈশ্বরের নামে ঘাবড়ে যান। যতই অনটন থাকুক, ঈশ্বরের ইচ্ছে, অন্ন মাপা আছে, তারা খেয়ে যায়। যে যারটা খায়, তুমি খাওয়াবার কে!

মা বাবার কথায় ক্ষেপে যায়।

মা-র এক কথা, তোমার ঈশ্বরের আর কত ইচ্ছে হবে। আর কত ইচ্ছে হবে! কে করে! ঈশ্বর মনে মনে যা মর্জি দেখান, বাড়ির লোকজন না সব পালায়। ডজন ডজন ঈশ্বর তোমার। আর তার ডজন ডজন বায়না।

নবমী বুড়িকে তুলে নিয়ে আসা হবে শুনে মা মহাখাপ্পা। বাড়িটাকে কী অনাথ আশ্রম করে তুলবে ভেবেছ। সকাল থেকে শুরু—ফুল তোলা, দূর্বা তোলা, আজ তাল নবমী, কাল অষ্টনাগ, কে করে! যাব বের হয়ে।

বাবারও তখন চোটপাট।—যাও না বের হয়ে। কোথায় যাবে! কতদূর যাবে। গিয়ে থাকতে পারবে! মন টিকবে! কেবল কথায় কথায় যাব বের হয়ে ভয় দেখাও। বাড়ি থেকে রোজ তো নবমীর অন্ন জঙ্গলে দিয়েই আসতে হয়। হাঁটা চলা করতে পারে না, শেয়াল খাটাসে জ্যান্ত চিবিয়ে খেলে ঈশ্বরের মহিমা বাঁচে। একটা তো পেট। দশজনের সঙ্গে চলে যায়।

পিলুর রাগ কী সহজে পড়ে! নবমী ও বাবার কাছে ঈশ্বরেরই মহিমা। যেন জ্যান্ত বিগ্রহ তুলে আনা হচ্ছে বাড়িতে। দাদাকে পর্যন্ত বলেছিলেন, বাড়ি থেকে বিকেলে বের হবে না। নবমী শেষকালটায় ঈশ্বরের কাছে সেবা শুশ্রূষা চায়।

পিলুর মজা লাগে শুনতে—বাবাও তখন নিজে ঈশ্বর।

—বাবা তুমি ঈশ্বর!

—হ্যাঁ ঈশ্বর বৈকি! তাঁরই অংশ সবাই। গাছপালা, কীটপতঙ্গ সব তাঁর করুণার অংশ—সেটা বোঝো!

দাদা যে দাদা, গোঁয়ার গোবিন্দ, পরীদিকে মেরে বাড়ি থেকে বের হতে লজ্জা পাচ্ছিল, সেও সুপুত্র হয়ে গেল। সাঁজ লাগার আগে রওনা হওয়া গেল। দাদাকে ডাকতেই সুড় সুড় করে বের হয়ে এল। বাড়ির তিন কর্তা হাজির নবমীর ডেরায়। অ মা, গিয়ে তাজ্জব। বলে কিনা তার কাঁথা,

পোঁটলাপুঁটলি ছাগল, কাঠের পেটি নিতে হবে সঙ্গে। বাবা যত বলেন, ছাগলটা পিলু নিচ্ছে, এ-সব নিয়ে কী হবে! তত নবমীর বায়না, বাবাঠাকুর না না, যাবে। এক কথা তার।

হাত জোড় করে মিনতি—বাবাঠাকুর!

—আরে মহামুশকিল, নোংরা কাঁথা বালিস দিয়ে কী হবে।

তাও না হয় হল। তার কাঠের পেটিও নিতে হবে। বাবা বলেছিলেন, কী আছে দেখতো পিলু।

সে তো ঢাকনা খুলে থ। ক'খানা ইট।

—আরে ইট দিয়ে কী হবে! ক'খনা ইটে কী ঠাকুরের মন্দির হবে। না আমি মরলে মন্দির তুলবে!

নবমী রা করে না। হাতজোড় করে বসে থাকে। বনজঙ্গল থেকে হাওয়া বয়। দূরে শেয়ালেরা ডাকে। বিড়ম্বনার এক শেষ, বাবাও নেবে না। পিলুও রাজি না। দাদা তো ঘরেই ঢুকছে না— এত দুর্গন্ধ। কিন্তু নবমীও ছাড়ার পাত্র নয়।

হাতজোড় করে এক কথা, বাবাঠাকুর।

ঐ পর্যন্ত। যেন বাবাঠাকুরের পর আর কোনো কথা নেই।

তার যে কী রাগ হচ্ছিল! এত ঝঞ্ঝাট কে পোহাবে। এত বাহানা তোমার! ইট ক-খানাও নিতে হবে! এতটা পথ! তোমার ছাগল, তোমার কাঁথা বালিস, পোঁটলাপুঁটলিকে নিয়ে যাবে! না কিচ্ছু যাবে না। ছাগলটা যাবে। বনজঙ্গলে ফেলে রাখা যায় না বলেই যাবে। আর কিচ্ছু যাবে না। যেতে হয় চল, নয় পড়ে থাকল।

নবমী বসে আছে হাত জোড় করে। উঠছে না। কাঁহাতক পারা যায়! সহ্য হয়! সে ইটগুলো ফেলে দিতে যাবে রাগে। তখনই নবমী হল্লা জুড়ে দিয়েছিল। পিলু ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল একটা। ভেঙে গেল। গোল ছোট্ট মোয়ার মতো উজ্জ্বল গাত্রবর্ণের কী দেখে তাজ্জব। বাবা তাজ্জব, দাদা তাজ্জব। তার তো মাথা খারাপ। বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। শুধু বললেন, সব ইটে মোয়া রেখেছ। ইটের ভিতর স্বর্ণপিণ্ড!

নবমী বাবার পায়ে গড় হয়েছিল।

একজন ডাকাত মানুষ, তার নারীর জন্য শুধু বনজঙ্গলই রেখে

যায়নি—কিছু স্বর্ণপিণ্ডও রেখে গেছে। পাছে অর্থকষ্ট হয়। কিন্তু নবমী সব আগলে রেখেছে। ডাকাত মানুষটার স্মৃতি। তার যে পরিত্যক্ত ইটের ভাটা স্বামীর ঘর হয়ে গেছে।

বাবা দুই পুত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, বোঝো এবার। তারপরই ইদানীংকার আপ্তবাক্যটি উচ্চারণ—বুঝলে কেহ আত্মাকে আশ্চর্যবৎ মনে করে—কেহ বা আশ্চর্যবৎ বলিয়া আত্মাকে বর্ণনা করে—আবার কেহ আশ্চর্য বলিয়া শোনে। কিন্তু ইহার বিষয় শুনেও কেহ ইহাকে বোঝে না।

সেই নবমীর এখন সাধ, তার ভিটায় যেন একখানা শিবলিঙ্গ স্থাপন করা হয়।

সে শুনেই হম্বিতম্বি শুরু করেছে। নবমী তোমার এত সাধ থাকলে জঙ্গলে পড়ে থাকলেই পারতে। কে করে!

বাবা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন।—কে করে মানে!

পিলুও আজকাল বাবার মুখে মুখে উত্তর করে। বাবা তখন গুম মেরে যান। কখনও তার ভুল ধরিয়ে দেন। কে করে মানে ঈশ্বর করেন। নবমীর ভিটায় শিবলিঙ্গ স্থাপন হবে কী হবে না তাঁর মর্জি। তুমি বললেও হবে না, না বললেও আবার হতে পারে।

হয়ে গেল!

সকাল থেকে এই করে তার চোটপাট শুরু। বাবা রাজি হয়েছেন। ইটের ভাটায় আর ক'খানা বেশি ইট পুড়িয়ে নিলেই হবে। বাড়িতে এই রাজসূয় যজ্ঞ চলছে, আর তার দাদাটা কলকাতায় গা ঢাকা দিয়ে আছে। কেউ কোনো খোঁজখবর নিচ্ছে না। আজ বাড়িতে ঠাকুরের ভোগ হবে। দু-দশজনকে বলাও হয়েছে—প্রসাদ নেবার জন্য—মা সকাল থেকে লেগে পড়েছে। বৃন্দাবন করের বৌ এসে গেছে। বাড়িতে গোবিন্দভোগ আতপ চালের ভাত হবে। পায়েস হবে। পিঠে পুলি কালই করে রাখা হয়েছে। ঠাকুরকে দেওয়া হবে না, তবে যারা আমন্ত্রিত তাদের পাতে দেওয়া হবে। কাল থেকে বালতি বালতি জল তোলা, ড্রামে ভরা, নিরাপদদা সকাল থেকেই কাজে লেগে গেছে—সে চেলাকাঠ এনে ফেলছে। গর্ত করছে। উনুনে বড় কড়াই, বড় তামার ডেগ বসানোর মতো গর্ত করা হচ্ছে। আর তার দাদার কথা একবারও কেউ মনে করছে না!

মাথা কী গরম সহজে হয়! একবার দাদা ফিরে আসুক, মজা বুঝবে।

বাবা বললেন, পিলু, কাজের বাড়িতে মেজাজ খারাপ করতে নেই। মা-র কথা শুনতে হয়। দেখাছিস তো কেউ বসে নেই!

বাবা পিলুকে আজ বেশ তোষামোদ করে কথা বলছেন। সকালবেলায় স্কুলের মাঠে তার কত কাজ। সবাই এসে বসে থাকবে। একটা দড়ি যোগাড় হয়ে গেছে। দুটো বাঁশও। চাঁদা তুলে বল কেনা হয়েছে। সে না গেলে কেউ কাজে হাত দেবে না। কিছুতেই মা আজ সাইকেল হাতছাড়া করবে না। চাবিটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। সে দৌড়ে গেছে। সনতের দোকান থেকে খেজুরের গুড় এনে দিয়েছে। সাইকেলটা দিলে কত তাড়াতাড়ি হয়! সেই সাইকেলটাই হাত ছাড়া! কার মাথা ঠিক থাকে।

আর এ-সময়ই বাবার কী মনে হল কে জানে! ডাকলেন, পিলু, শোন। পিলু রাগে ক্ষোভে থম মেরে আছে। কিছু বলছে না। বাবা বললেন, যখন ভোগ হচ্ছেই, এক কাজ করলে হয় না! তুই কী মনে করিস—একবার শহরে খবর দিলে হয় না, বিলুর বন্ধুদের। অন্ন প্রসাদ নিত তারা।

বাবার এ-হেন বিবেচনায় পিলু আরও ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। দাদা বাড়ি নেই, ভোজ হচ্ছে! দাদার বন্ধুরাও ভোগ খাবে। তাদের বলে আসতে হবে। সাইকেলটা সে এই অজুহাতে পেয়ে যেতে পারে। আসলে সাইকেলে তালা পড়ার পেছনে বাবার কোনো উসকানি থাকতে পারে। দিন-রাত টো টো করে বেড়ানোর স্বভাব হয়ে গেছিল। বাবা বার বার সাবধান করেও পারেননি। সাইকেলই তোমাকে খাবে। কিন্তু সেতো কথা শোনার পাত্র নয়। তাকে জব্দ করতে হলে সাইকেলে তালা না দিয়ে রাখলে চলবে না। প্রতিবেশীরা তার সাইকেল, আর ট্রাকের বাজি রেখে খেলা দেখে ফেললেই বাবার কাছে এসে নালিশ, ঠাকুরকর্তা, পিলু তো যমের সঙ্গে লড়ালড়ি শুরু করে দিয়েছে। তারপর বিশদ বর্ণনা। অভিযোগ এক দু-দিন নয়—মাঝে মাঝেই ওঠে। আজ কাজের দিন, কোনো অনর্থ ঘটলে—শুভ কাজ পণ্ড। তার চেয়ে সংসারে বাবার শুভ কাজের দাম বেশি!

সে বলল, আমি পারব না।

বাবা বললেন, সাইকেলটা নিয়ে মুকুল নিখিল সুধীনকে অন্তত বলে

আয়। ওরা তো আমার বাড়িতে অন্ন প্রসাদ কখনও গ্রহণ করেনি! গেরস্থের এতে মঙ্গল হয় জানিস।

সাইকেলটা হাতে পাবে জেনেই সে শেষে রাজি হয়ে গেল। বলল, দাও তবে বলে আসি।

বাবা বললেন, মিমিকেও খবরটা দিস।

বাবা একপ্রস্থ ফর্দ দিয়ে নিরাপদকে আবার বাজারে পাঠিয়েছেন। পিলু সাইকেল নিয়ে বের হয়ে গেল। সে সাঁ সাঁ করে ছুটে যেতে থাকল। এবং যাবার আগে স্কুলের মাঠে বলে গেল, আজ আর তাকে পাওয়া যাবে না। বাবা অশ্বমেধ যজ্ঞ শুরু করেছেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ কী সে জানে। নবমীকে বিকেলে রামায়ণ মহাভারত পাঠ করে শোনানোর দায়িত্ব মাঝে মাঝে তার উপর বর্তায়। দুলে দুলে সুর ধরে পড়তে মন্দ লাগে না। অভিমন্যু বধ পড়তে পড়তে সেও সবার সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে ফেলে। সুভদ্রা জননী যেন আর কেউ না। তার নিজের মা-র কথা মনে হয়। উত্তরার কথা মনে হলে তার পরীদির মুখ ভেসে ওঠে। যেন পরীদিরই কাজ, দাদা যে আজ নিখোঁজ পরীদি তার জন্য দায়ী। সাজগোজ করিয়ে রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে এখন নিজে হা হুতাশ করছে।

কারণ সে পরীদিকে আবার দেখেছে, দাদার খোঁজ খবর না পেয়ে কেমন মনমরা হয়ে গেছে।

পরীদি নিজেও গেছিল কলকাতায়। ফিরে এসে বাবাকে সব খবর দেওয়া চাই।

পত্রিকা অফিসে গেছে। কবিতার নিচে নাকি নাম ঠিকানা লিখে দিতে হয়। ওদের খাতা থেকে যে ঠিকানাটি দেওয়া হয়েছে, তা অপরূপার ঠিকানা। মুকুলদার বাড়ির ঠিকানায় পত্রিকা এসেছে পরীদি খবর দিয়ে গেছিল।

তারপর পরীদি আবার খোঁজাখুঁজি করেছে কলকাতায় গিয়ে। সেখানে বেলাঘাটা বলে একটা জায়গা আছে। চাউলপট্টি রোড বলে রাস্তা আছে। পোড়ো ভাঙ্গা বাড়ি, সরকার বাড়ির মাঠ পার হয়ে বড় বড় সব পুকুর ডোবা। কুঁড়েঘর সারি সারি। তারপরই একটা খাল। হাড়ের কারখানা—কী দুর্গন্ধ। সেই বস্তিতে পরীদি খোঁজ নিতে গিয়ে মহা

বিপর্যয়ে পড়ে গেছিল। খুঁজতে খুঁজতে রাত হয়ে গেছে। ঝড় বৃষ্টি, আর সেই পুকুর ডোবা নালা ভর্তি ছোট ছোট ঝুপড়ি। প্রেসের কোন কিরণ বাবু বলেছে, হ্যাঁ এই নামে তো একজন আমাদের প্রুফ দেখে। ঠিকানাটা দেখুন তো। পরীদি দেখেছে—দাদার সই। নিচে কী সব নম্বর দিয়ে লেখা চাউলপট্টি রোড। জায়গাটা যে এত দুর্গম হতে পারে, এমন আস্তাকুঁড় হতে পারে পরীদি নাকি চিন্তাই করতে পারেনি। বিলু কী নিজেকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। হাড় পোড়া দুর্গন্ধ, খাটা পায়খানা, মানুষ শুয়োর গাদাগাদি করে আছে। সেখানেও পরীদি খুঁজে এসেছে। সন্ধ্যা বলে একটি মেয়ে খবর দিয়েছে, বিল্ববাবু কখন আসে, কখন থাকে, কখন যায় আমরা কেউ টের পাই না। তার ঘরটাও দেখিয়েছে। ঘরে কিছুই নেই। টিনের বাক্স। একটা খাটিয়া। একটা মাটির জার। জল নেই।

পরীদি তারপর আর একা যেতে সাহস পায়নি। পার্টির দু-জন ক্যাডারকে নিয়ে খুঁজতে গেছে। গিয়ে দেখে নেই। পরদিন সকালেই নাকি ভাড়া মিটিয়ে সুটকেস হাতে নিয়ে চলে গেছে কোথায়।

এমন দাদা যার, তার ভাই আর কত ভাল হবে! তুই পরীদিকে নাকের জলে চোখের জলে এক করছিস। তোর মায়া দয়া নেই! বাবার জন্য কষ্ট হয় না! মা-র জন্য! তুই অত কী রাজকার্য করতে গেলি, আমাদের কথা ভুলে গেলি! পরীদির গন্ধ পেলেই পালাস। তুই বল, পরীদির কী অপরাধ! পরীদির পার্টি করা তুই পছন্দ করিস না, নাটক করা পছন্দ করিস না। তুই এত স্বার্থপর দাদা! পরীদির এটা বিলাসিতা! বিলাসিতা হলে, তোর ঘরে রাতে শুয়ে ঘুমাতে পারে! আলো নেই, পাখা নেই। জানালা বাঁশের কঞ্চির। ছোট্ট জানালা। হাওয়া বাতাস কিছু ঢোকে না, থাকতে পারে! পরীদি তো আমাদের বাড়ি এলে যেতেই চায় না।

এ-সব ভাবলেই পরীদিকে মনে হয় সেই উত্তরা—যে নারী তার যুবরাজকে যুদ্ধের পোষাক পরিয়ে দিচ্ছে। মাথায় উষ্ণীষ, শরীরে বর্ম, ঢাল, তরবারি, তূণ পিঠে! সব দিয়েছে, কেবল সপ্তরথী ঘিরে ধরলে, সে জানত না কী করে বাঁচতে হয়। ব্যূহ থেকে বের হতে হয়। দাদাও কী কোনো অদৃশ্য সপ্তরথীর বাণে জর্জরিত। না-হলে পালাচ্ছে কেন বার বার। সে পরীদিকে কী আর মুখ দেখাতে চায় না। জীবনের সেই জয়, যা সহজ

লভ্য নয়, করতলগত নয়—যার জন্য সে অস্ত্রবিদ্যায় বিশারদ হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে, হয়তো ঠিকঠাক পারছে না, সে পাখি দেখলে মুণ্ডু দেখতে পায়, চোখ এখনও দেখতে পায় না, যতদিন না তার সেই দেখা পূর্ণ হচ্ছে, ততদিন কী অজ্ঞাতবাস চলবে!

সে সবাইকে বলে ফিরে এল। কেন যে আজ মনে হল, সত্যি এই কাজের দিনে তার বাড়িতেই থাকা দরকার। সে না থাকলে বাবা একা। সে ফিরে এসে দেখল, পরীদি রান্নাঘরে বসে মুগের ডাল বাছছে। পরীদিকে গিয়ে বাড়িতে পায়নি।

পরীদিকে বাড়িতে আর কেউ কিছু বলে না। তবে বোঝে পরীদিকে নিয়ে প্রচণ্ড তিক্ততা চলছে। পরীদি কোথায় বললে, এক কথা, তা তো তোমরা ভাল জানবে। সে তো আমাদের কিছু বলে যায় না। সুহাসদাও নাকি একদিন ফোন করায় তার দাদামশাই বলেছিল, জানি না। বরং আমি জিজ্ঞেস করছি সে কোথায়! আমার মানমর্যাদা নিয়ে তোমরা আর কত হোলির রঙ খেলবে। সে কোথায় আছে, থাকবে, সে তো তোমরা জানবে। তোমরা তার সুহৃদ। আমরা তার শত্রু। সে কোথায় ঘোরে থাকে খায় তোমরাই আমার চেয়ে বেশি জানবে।

পিলুর এ-জন্য আরও বেশি কষ্ট। কোথাও যেন ঠাঁই নেই। পরীদি বাড়িতে থাকে খায়, খুশি মতো ফেরে, বাড়ির কাজের লোকদের সঙ্গেই যা সম্পর্ক। পরীদির কখন কী দরকার জানে। পরীদি ইচ্ছে করলে প্রাসাদের মতো বাড়িতে নিরিবিলি, নিজের ঘরে, বারান্দায় বসে চুপচাপ যেমন দিন যাপন করতে পারে আবার তেমনি, সহসা সিঁড়ি ধরে নেমে নিজের লাল রঙের সাইকেল নিয়ে উধাও হয়ে যেতে পারে। শুধু বাড়িতে খবর রেখে যায়, যেন খবরটা দাদামশাইকে দেওয়া হয়।

এখন যে পরীদি মুগের ডাল বাছছে সেও আর এক পরীদি। পার্টি করা, নাটক করা, কিংবা ক্যাডারদের নিয়ে মিছিল মিটিং করা পরীদি যেন এ নয়। ঠিক মা-র মতো, বাবার মতো একেবারে ঠাকুর ঘরের পবিত্রতা নিয়ে বসে আছে। চাল বেছে টাগারিতে রাখছে। মাকে ডেকে বলছে, এতেই হয়ে যাবে। পিলুকে দেখে বলেছে, পিলু বসে থাকিস না। নিরাপদকে নিয়ে কলার পাতা কেটে আন। আর শোন, কলার পাতাগুলো

ধুয়ে রাখ। তারপরই পরীদি রান্নাঘরে ঢুকে বলল, মাসিমা, এ কী! কাঁদছেন কেন!

পিলু দেখল বাবা বেশ তটস্থ হয়ে উঠেছেন। কেন কাঁদছে বাবা টের পেয়ে গেছে। কারণ বাবার সঙ্গে যা কিছু মান অভিমান ঝগড়া রাতের বেলা। দাদা বাড়ি নেই, অথচ বাড়িতে অন্নভোগের আয়োজন হচ্ছে, লোকজন খাওয়ানো হচ্ছে, কেউ পারে—বড় পুত্রটি কোথায় আছে, তার কোনো সঠিক হদিস পাওয়া যাচ্ছে না—তিনি এখন অন্নভোগ নিয়ে পড়লেন।

পিলুর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। মুখ কালো হয়ে গেল। সে শুনতে পাচ্ছে, মা বলছে, কাঁদি আর সাধে মা। যার মানুষের কোনো হুঁস নেই, তার কান্না ছাড়া আর কী সম্বল আছে বল! একবার গেল, কলকাতায় কোথায় আছে খুঁজতে গেল! তোমার বাবা দাদামশাই পারতেন। নির্বিকার পুরুষ।

বাবা বললেন, আরে পরী পাত্তা করতে পারল না, ধরেও ধরতে পারল না, আমি গেলে তো বিষম কাণ্ড হবে।

হঠাৎ মা কেমন দজ্জাল গলায় বলে উঠল, লজ্জা করে না, যখন বলেছিলে, এমন কু-পুত্রের মুখ দর্শন করব না। তারপর পরীদির দিকে তাকিয়ে বলল, আমার সোজা সরল ছেলেটার উপর এত অত্যাচার! ভগবান সহ্য করবে! পরী, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, বিলু আমাকে বলেছে, এক বর্ণ মিথ্যা বলছি না। বলেছে, মা আমি মারিনি। মারতে পারি না। বিশ্বাস কর আর যাই করি আমি পরীকে কখনও মারতে পারি না।

এ-কথা শোনার পর পরীদিও মুখ আড়াল করে ফেলল। দু-হাতে মাকে সামলাচ্ছে, আর মুখ নিচু করে ফেলছে। উদ্গত অশ্রু সামলে কেন যে পরীদিও বলছে, মাসিমা থামুন। মাসিমা, আমিও জানি ও মারেনি, মারতে পারে না। মাসিমা থামুন।

—আমি থামব বল! নিষ্কর্মা মানুষের এত বড় কথা! তোমার দাদামশাই কী বললেন, আর তিনি বিশ্বাস করে ফেললেন। আমার ছেলে কারো গায়ে হাত তোলার ছেলে! তুমি তাকে কী না বলেছ! তুমি না গেলে ও কখনও ফেরে! সে তোমার কু-পুত্র!

পিলু, নিরাপদদা, বৃন্দাবন করের বৌ, মায়া সবাই মা-র এই দজ্জাল স্বভাবে কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছে।

—আর তুমি বাড়ি বসে ধর্ম দেখছ। বলছ, পাপ খণ্ডন হোক, পাপ খণ্ডন হোক। সহ্য হয় বল! একবার একটা চিঠি পর্যন্ত দিলে না। গেলে না! বললে না গিয়ে, চল, যা হবার হয়ে গেছে। বাড়ি চল। বসে থাকলে! উৎসব, ইটের ভাটা, মন্দির শিবলিঙ্গ—কত আয়োজন, আর আমার ছেলেটা একটা আঁস্তাকুড়ে পড়ে আছে! বলে আবার হু হু করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

পরীদিও মা-র সামনে বসে পড়েছে। মা-র মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বলছে, মেসোমশাইকে নিয়ে আমি যাব। ঠিক খুঁজে বের করব। আপনি এ-ভাবে কাঁদবেন না। কী খারাপ লাগছে বলুন তো? ঐ দেখুন পিলু মায়া সবাই কাঁদছে। আমি কাকে সামলাই। তারপরই ধমক, এই পিলু, হচ্ছেটা কী। মায়া, যা এখান থেকে—যা!

পরীর মুখে এসে গেছিল, আপনার পুত্রটি মানুষ না অপদেবতা। কিন্তু মাসিমা কষ্ট পাবেন!

কার জন্য কাঁদছিস! সে কারও দুঃখ বোঝে! পিলুকে বলার ইচ্ছে।

পরী শেষে বললে, মাসিমা, অবুঝ হলে চলবে কেন। চিঠি কাকে দেবে! মেসোমশাই যাবে কোথায়! মেসোমশাইয়ের দোষ কী। দাদামশাইয়েরও দোষ নেই। তারা যে যার মতো বুঝেছে। কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। ঐ দেখতো পিলু, কারা আসছে। এগিয়ে যা।

কারা আসছে বলায় মা-র সম্বিত ফিরে এল। রান্নাঘরের কোণায় ঢুকে ঘটিতে জল নিয়ে বাইরে গিয়ে মুখ ধুয়ে এল। এখন পিলু কিংবা মায়া, পরী সবাই জানে, মা-র মুখে যতক্ষণ হাসি না ফুটে উঠবে ততক্ষণ, এই বাড়ির গাছপালায়ও অদৃশ্য কুয়াশা লেগে থাকবে। ভেজা আবহাওয়া—ভারি স্বভাবের হয়ে যাবে ঘর বাড়ি—অন্ধকার হয়ে থাকবে সবার ভেতরটা। একমাত্র মাসিমার মুখে হাসি ফোটাতে পারলেই আজকের অন্নভোগ সার্থক।

বাবা হঠাৎ উঠোনে দাঁড়িয়ে বললেন, মন খারাপ করবে না। অন্নভোগ সবারই কম বেশি থাকে। তার হাত থেকে কে কবে রেহাই পেয়েছে।

রাতের দিকে বাড়িটা কেমন নিঝুম মনে হল পরীর। সে পিলু মাসিমা বারান্দায় বসে গল্প করছিল। মাসিমা রাতে কিছু খাবেন না। পরীরও খাবার ইচ্ছে নেই। শীতের বেলা শেষ হতে সময় লাগে না। তাদের খেতে খেতে বেলা পড়ে গেছিল। অবেলায় খেয়ে রাতে আর খাবার ইচ্ছে নেই।

মেসোমশাই বলছিলেন, তোমার মাসিমার বুদ্ধিতেই জমিটা কেনা হয়েছিল। ভাগ্যিস কিনেছিলাম। চার পাঁচ বছরে কী দাম হয়ে গেল!

বাবার কাছে এটা খুবই কৃতিত্বের খবর। পিলু এটা বোঝে। বাবা যে এখানে এই গভীর বনজঙ্গলের মধ্যে প্রথম ঘর বাড়ি বানান, পরীদিকে কতবার যে সে খবর দিয়েছে। পরীদিও যতবার শুনেছে, যেন এর আগে শোনেনি।—তাই নাকি! এত দাম হয়ে গেল জমি!

পরীদি যে খুবই বুদ্ধিমতী বোঝে। এক দাদা ছাড়া বাড়িতে পরীদির আর কোনো শত্রু নেই। রাত হয়ে যাওয়ায় আজ থেকে গেল। পিলুর এটা যে কী আনন্দের! বিকাল থেকেই পেছনে লেগেছে, পরীদি আজ যাবে না। আমি বলে আসব। তুমি থাক পরীদি। একটা তো রাত। থেকে যাও।

আসলে এটা কেন হয় সে বোঝে না। তাদের বাড়িতে অতিথি অভ্যাগত কেউ আসে না। মানুকাকা শহর থেকে এলে, গাছের পেঁপে, আমের সময় আম, বেলের সময় বেল—যেদিনকার যা ফল ব্যাগ ভরে নিয়ে যায়। বাবার তখন কী আনন্দ! এটা নে, ওটা নে। আর মা-র তখন নানা অভিযোগ। গজ গজ করবে, দিয়ে দাও, সব দিয়ে দাও। এসে তো উঠেছিলে, তাড়াবার কত ফন্দি করছিল! এখন তো বলছে, ধনদা, আমার জন্য জমি দেখুন। রিটায়ার করে ভাবছি এখানেই বাড়িঘর বানাব।

আসলে পিলুর কাছে বাবার এই জায়গা নির্বাচন নিয়ে, এক ধরনের অহঙ্কার আছে। বাবাই পারেন, বোঝেন, কেন না, এখানে না এলে সে এই গভীর বনজঙ্গলের স্বাদই পেত না। নবমীকেও আবিষ্কার করা হত না। এক সময় তো তাদের কী ভয় লাগত! বাবা বাড়ি নেই, জঙ্গলের মধ্যে বাড়িটা—চারপাশ নিঝুম, আকাশে কিছু নক্ষত্র বাদে তাদের দেখবার কেউ নেই—তখন কুকুরের বাচ্চা তুলে এনেছিল একটা—কী না দিন গেছে!

মা কথা বলছে না। সকালে দাদার জন্য কান্নাকাটি করার পর আর

কোনো অশান্তি করেনি ঠিক, তবু নিখোঁজ পুত্রটির জন্য সারা দিন এক চাপা দুঃখ বয়ে বেড়িয়েছে।

পরীদি চলে যেত, কেবল তার মনে হয়েছে, এই পরিবারে সে যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ কিছুটা যেন অবলম্বন থাকবে। নবমী পাশে বসে ঝিমোচ্ছিল। নবমীর খুব ইচ্ছে ছিল, আজ সে তার মরদের গল্প করে। কিন্তু কেন যে বার বার মরদের কথা তুলতে গেলেই পিলু ধমকে উঠেছে।—থাম তো। ডাকাতের গল্প কে শুনবে!

পরী বলল, আজ ডাকাতের গল্পই হোক। তুই ওকে ধমকাচ্ছিস কেন!

—ও পরীদি, শোন না! ডাকাতের গল্প কী শুনবে—বাবা, তুমি একবার একটা ল্যাংড়া গরু নিয়ে এসেছিলে না!

ল্যাংড়া গরুটার কথা উঠতেই মাসিমা কেন হেসে ফেলল সে বুঝল না।

মাসিমা বললেন, আর বল না, সে যা গেছে। চণ্ডীপাঠের নামে বের হতেন, ফেরার নাম থাকত না।

পরীর মনে হল, তা-হলে মাসিমাও ডাকাতের গল্পই শুরু করেছেন।

পরী বলল, কোথায় থাকত।

মা হেসে বলল, জিজ্ঞেস কর না, কোথায় যেত।

বাবা বললেন, আমার তখন সসেমিরা অবস্থা বুঝলে। যে যেখানে পূজা আর্চার খবর দিত, চলে যেতাম—সেখান থেকে আবার এক জায়গায়—বাড়িতে থেকে তো লাভ নেই। উপার্জন চাই। ছ' ছটা মুখ। বোঝো। তা একবার ছেলেদের দুধ খাওয়াবার সখ হয়েছিল···বলে বাবার সেই গরু আনা এবং পিলুর সড়কে দাঁড়িয়ে থেকে বাবার আবিষ্কারের কাহিনী বললে, পরী কেমন হতবাক হয়ে গেল।

—বুঝলে পরী। কী না বলেছে তোমার মাসিমা! আমি অবলা মানুষ, বলেই পিজরাপোঁলে না দিয়ে গরুটা বামুনকে দান করে দিয়েছে। দুধ দিল না ঠিক, তবে কী জান, বামুনের বাড়িতে গোবরটাও তো কম নয়। ওটা ওরা বোঝে না! তখন ওটুকুই বা আমাকে কে দেয়। কত জায়গা থেকে আম জামের কলম, কাঁঠালের কলম এনে লাগিয়েছি। সারা বাড়িটায় এত যে গাছপালা তারও প্রাণ আছে জান! তোমার মাসিমা কত আমাকে

বকাবকি করেছে জান! নিবুর্দ্ধিতার শেষ নেই।

নবমী বলল, আমার মরদ না, একবার জেল খেটে এল। দু সাল। আসার সময় আমার জন্য একটা টিয়া পাখি নিয়ে এসেছিল। পিলু বলল, আবার মরদের গল্প! থাম বলছি।

একটা হারিকেন জ্বলছে। বারান্দার এক কোনায় জলচৌকিতে বাবা বসে আছেন। মা পরীদি মায়া মাদুরে বসে আছে চাদর গায়ে। —চারপাশে বাড়িটার গাছপালার ছায়া, এই হারিকেনের আলো এবং পরিবারের সবাই আজ অনুষ্ঠানের পর কেন যে এত অতীতের গল্প নিয়ে পড়েছে পিলু তা বোঝে। কোথা থেকে কোথায় তারা উঠে এসেছে। নবমীকে দেখলে মনেই হবে না, তারই গুপ্তধন আজ এই গরীব বামুনের পরিবারটিকে স্বচ্ছলতার মুখ দেখিয়েছে। আসলে পিলুর ভেতর মায়া দয়া বেশি। পিলু এ-জন্য কম ধমক খায়নি। একবার কোত্থেকে নিয়ে এসেছিল, একটা বাচ্চা বাঁদর। ট্রাকের তলায় চাপা পড়ে মাটা মারা গেছে। বাচ্চাটা যায় কোথায়! এই মায়া দয়াই নবমীর কাছে নিয়ে গেছে তাকে। এই মায়া দয়াই শেষে গুপ্তধন এনে দিয়েছে সংসারে।

নবমী বলে একটা বুড়ি আছে জঙ্গলে সবাই জানত। কী খায়, কোথায় থাকে, কী পরে, কেউ খোঁজ নিত না। ওর কঙ্কালসার শরীর শনের মতো চুল আর প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় ঘোরাফেরা—কাউকেই কাছে টানেনি। বরং দেখলে পালিয়েছে। নবমী ঠিক বুঝতে পেরেছিল পিলুকে। ঠিক মানুষকেই সে চিনেছে। পিলু না নিয়ে এলে জঙ্গলেই মরে থাকত। ওর ইটকখানা ইটের পাঁজার মধ্যে পড়ে থাকত। মানুষের কাজে লাগত না। পরীদি জানে না। একবার ইচ্ছে হল বলে। তারপরই বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, বলি বাবা?

বাবা বললেন, তোমার আবার কী বলার আছে! তুমি তো কোথাও পালাওনি। কাল ফিরবে বলে পক্ষকাল পরে ফেরনি। কোথাও ডাকাতি করেছ বলেও জানি না।

বাবার এই কথায় সবাই হেসে উঠল।

পরী ভাবল, যাক, যে চাপা কুয়াশায় ঢেকেছিল বাড়িটা তা যেন কেটে গেল।

—বলি বাবা!

—বল না। আমি বারণ করব কেন!

—না ঐ যে ইট, নবমীর ঘরে ইট।

—অ সেই কথা! পরীকে বলনি! পরী জানে না!

পরী বুঝল না, পরী কী জানে না।

পিলু গল্প বলার মতো যেন সব বলে গেল। পরী শুনে হাঁ। নবমী তবে তার ডাকাতের ধন ইটের মধ্যে রেখে দিয়েছিল।

নবমীকে এমন প্রশ্ন করলে বলল, না না, ডাকাতের ধন হবে কেন? ও আমার গয়নাগাটি। কত যে ছেল। সব গলিয়ে রেখে দিয়েছিল। বনজঙ্গলে থাকি, কার কখন নজর যাবে—

পরী অনেক দিন থেকে এই বাড়ির মানুষগুলির সঙ্গে মিশে আছে। নবমীকে তুলে আনার মধ্যেও মহত্ব আছে—কিন্তু গুপ্তধন মেসোমশাই কিছুই নিজে ভোগ করছেন না—ঈশ্বরের প্রতি তাঁর এই নির্ভর কেমন যেন বিচলিত করে তুলল। সে এত দিন যা জেনেছে, যা পড়েছে, তার সঙ্গে মানুষের আত্মবিশ্বাস এবং ধর্মবিশ্বাসে কোনো ফারাক আছে বলে ভাবতে পারল না। সত্যি তো এ-দেশে গরীব মানুষের তো কিছুই নেই। কবে হবে তাও জানে না। কিন্তু একটা পরিবারকে এই বিশ্বাসই কী প্রবলভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে—মেসোমশাইকে না দেখলে সে টের পেত না।

সে বলল, মেসোমশাই, আমরা একটু ঘুরে আসি।

—কোথায়?

—আপনার বাড়ির সবটা আমি দেখিনি। আপনার গাছপালাও না।

বাবা তাতে খুবই খুশি। পরী বাড়ি ঢুকেছে, নবমীকে নিয়ে বনের মধ্যে গেছে। কিন্তু এই বাড়ির সব গাছপালা সে দেখেনি। কিংবা বাবা কোনো দিন বলতে পারেননি, কোথা থেকে কোন গাছের কলম এনে লাগিয়েছেন। শুধু লাগিয়েই ক্ষান্ত হননি, তার ফল খাইয়েছেন, সেখানেও শেষ ছিল না, খেয়ে যদি কেউ বলেছে, ভারি সুমিষ্টি আম, একটা কলম করে দেবেন। বাবা খুশি হয়ে কলম করে দিয়েছেন। কখনও বাড়ি বয়ে গিয়ে দেখে এসেছেন, তাঁর দেওয়া কলমের আদর যত্ন ঠিক হচ্ছে কি না!

জ্যোৎস্না রাতে পরী গাছগুলির পাশ দিয়ে হাঁটছে, পিলু কেবল বাবার

গল্প করছে। গাছপালার ছায়ায় হাঁটতে হাঁটতে মনে হল পরীর—মানুষ তার উত্তরপুরুষের জন্য এ-ভাবেই কিছু রেখে যায়। পরী কাঁঠাল গাছগুলির নিচে এসে দাঁড়িয়ে গেল। চারপাশে জ্যোৎস্না নেমে এসেছে। গাছপালাগুলি দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীর মতো। একজন মানুষের এর চেয়ে বড় কী আর অবলম্বন থাকতে পারে সে ভেবে পেল না। যেন বিলু কিংবা পিলু তাদের বাবার কথা এক দিন ভুলে যেতে পারে—কিন্তু গাছগুলি কোনো দিন ভুলবে না—কত যত্নে তিনি তাদের বড় করে তুলেছেন। মানুষের সৃষ্টির তো শেষ নেই। যে যার মতো কবিতা সৃষ্টি করে।

বিলুর কবিতা মেসোমশাইয়ের ভাল লাগবে কেন?

মেসোমশাই বলতেই পারেন, কবিতা লিখে কী হয়।

পিলু বলল, পরীদি, ওদিকটায় চল!

—কেন রে!

—বাবার বাতাবি লেবু গাছটা দেখবে না।

জ্যোৎস্নায় এই ভ্রমণ খুবই মধুর। আসলে তাকে নেশায় পেয়ে গেছে। যেন ইচ্ছে করলে সারা রাতই গাছপালার ভেতর এখন ঘুরে বেড়াতে পারে। বিলু পাশে থাকলে কী যে ভাল লাগত। আর সহসা কেন যে মনে হল, গাছপালার মতো চাই তার একজন সরল অকপট মানুষ।—যে বৃক্ষের মতো ছায়া দেবে।

সে এবার বলল, চল পিলু। রাত হয়েছে। এই মায়া আয়।

ঘরে মায়া আর মিমি। আলো জ্বলছে। হারিকেনের অল্প আলো জ্বালা। মশারির নিচে লেপ গায়ে দিয়ে মিমি পাশ ফিরে শোয়। মায়া শুয়ে পড়েছে। মিমি মশারি গুঁজে দিল এক দিককার। তক্তপোষটা খুব বড় না। তার অসুবিধা হবার কথা। তবু মানুষের কী যে থাকে! সে পা ছড়িয়ে দিলে একটা দিকের মশারি আলগা হয়ে যাচ্ছে। বিলুর জন্য এই ছোট্ট তক্তপোষ। এতেই সে বছরের পর বছর শুয়ে রাত কাটিয়ে দিয়েছে। কোনো অভিযোগ ছিল না।

কখন মনে হল, মায়া ঘুমিয়ে পড়েছে।

তার ঘুম আসছে না।

ঘুম আসার কথাও না।

গাছপালা লাগাবার মধ্যেও কবিতা আছে—ঘর বাড়ি বানাবার মধ্যেও কবিতা আছে। পূজা আর্চার মধ্যেও আছে—নবমীর জীবনের মধ্যেও। কোথায় নেই! স্বার্থপরতার চেয়ে এই কবিতা কম কৃতিত্বের নয় এমনই মনে হল তার। বিলুকে আজ কেন জানি সত্যি স্বার্থপর মনে হল তার। তবু তার নিজের জীবনের মধ্যেও কেন এই কষ্ট, দুঃখ বিলুর জন্য সে জানে না। কিছু শেয়াল ডাকল অদূরে। কীটপতঙ্গের আওয়াজ এত গভীর হয় আগে সে জানত না। যেন এক আশ্চর্য মিউজিক সৃষ্টি হচ্ছে। এই মিউজিক মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কত দরকার, বাড়ির গাছপালার ছায়ায় হেঁটে না বেড়ালে টের পেত না। বাড়ির অন্নভোগ কত সুস্বাদু আজ মাসিমার চোখে জল না দেখলে টের পেত না। তার চোখে জল এসে গেল।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে মিমি জানে না। সহসা ঘুম ভেঙ্গে গেল। কেউ যেন দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকছে, পিলু। দরজা খোল। পিলু।

কে ডাকছে! কে! মিমি কেমন ধড়ফড় করে উঠে বসল। তার বুক কাঁপছে। গলা শুকিয়ে উঠছে।

কে ডাকছে, কে!

অবিকল বিলুর গলা। বিল্ব কী তবে ফিরে এসেছে।

সে ডাকল, এই মায়া ওঠ, শিগগির ওঠ।

মায়া উঠে বসলে বলল, কেউ দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

মায়া ঠিক বুঝতে না পেরে বলল, কে?

—মনে হয় তোর দাদা।

—দাদা!

মিমি বলল, আস্তে। সে সন্তর্পণে নামল। হারিকেনের আলোটা উসকে দিয়ে এগিয়ে যাবার সময় মনে হল, হাত পা কাঁপছে। সে পড়ে যাবে। কোনো রকমে দরজা খুলতেই দেখল, কেউ দাঁড়িয়ে নেই। কেউ না। সে বাইরে বের হয়ে এল। না কেউ না। হতাশায় তার বুক ভেঙ্গে গেল। চিৎকার করে বলতে পারলে, সে সান্ত্বনা পেত— বিল্ব, আমি কী করব!

উঠোনে হারিকেনের সামনে অনাথ রমণীর মতো কে বসে! বিল্ব কাছে এসে বলল, তুমি!

মিমি কিছুই বুঝতে পারছে না। ভৌতিক মনে হচ্ছে সব কিছু।

—তুমি এখানে! রিকসাটা ছেড়ে দিতে গেছিলাম।

মায়া বুঝতে পারছিল না, পরীদি একা লণ্ঠন হাতে নিয়ে কোথায় গেল! বাইরে বের হয়ে অবাক। দাদা। হাতে সুটকেস। সে চিৎকার করে উঠল, বাবা, দাদা ফিরে এসেছে।

সহসা এই ঘরবাড়িতে সব আলো জ্বলে উঠল ঘরে ঘরে। পিলু চিৎকার করে বের হয়ে এসেছে—দাদারে। মা কেমন পাগলের মতো উঠোনে এসে লণ্ঠন তুলে পুত্রের মুখ দেখতে দেখতে বলল, এলি তবে! রাগ পড়েছে।

বাবা বললেন, তোমাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে। মুখে গোটা। দেখি দেখি। বলে বাবা লণ্ঠন তুলে কী দেখে বললেন, মায়ের দয়া হয়েছে! ও ধনবৌ, শিগগির বিছানার চাদর ওয়াড় পাল্টে দাও। গায়ে হাত দিয়ে বললেন, ইস জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে!

মিমির মুখে কথা সরছিল না। অন্ধকারে কোথায় দূরে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে।

বাবা, দাদাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে, ঠাকুরের চরণামৃত দিলেন খেতে। বললেন, ভালই হয়েছে। মহাপাপ খণ্ডন। কপালে দুর্ভোগ থাকলে কে খণ্ডাবে বল! যাক পাপ খণ্ডন হয়ে গেল। বোঝা নামল আমার।

মিমি বলল, পিলু, রিকসাটাকে বল থাকতে। আমি যাব।

বিল্ব ঘরে শুয়ে টের পাচ্ছিল। মিমি আর তার ঘরে আসেনি। রাতের ট্রেনে সে প্রায় তস্করের মতো পালিয়ে এসেছে। সন্ধ্যা জোর করে ট্রেনে তাকে তুলে দিয়ে গেছে। কেউ জানে না, সে সারা রাস্তায় প্রায় একজন তস্করের মতোই বসেছিল। ধরা পড়ে গেলে অনাসৃষ্টি হবে না কে বলতে পারে। তার সারা শরীরে কী ব্যাথা। গলা বুজে আসছে। কথা বলতে কষ্ট। পিলু মায়া মা বাবা সবাই দাঁড়িয়ে আছে পাশে। এখন এই রোগের প্রতিবিধান নিয়েই বাবা ফাঁপরে পড়ে গেছেন। মিমি যে এ বাড়িতেই আছে কারো যেন খেয়াল নেই।

বিল্ব কোন রকমে পাশ ফেরার চেষ্টা করল। কোনো রকমে বলল,

পরীকে ডাক।

পরী এলে বাবা বললেন, যাও তোমরা। সবাইকে নিয়ে বাবা বের হয়ে গেলেন। বিল্ব বললে, এত রাতে যাবে!

—অসুবিধা হবে না। পিলুকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

—জানি। পিলু না গেলেও তুমি একা চলে যেতে পার। তোমার অসুবিধা হবে না জানি। একটাতো রাত। নাই গেলে। বলে পাশ ফিরে বিল্ব চোখ বুজল। এ-মুহূর্তে বিল্বর যেন এর চেয়ে বেশি কিছু বলার অধিকার নেই। এত কষ্ট শরীরে—তবু সে বাড়িতে ফিরে পরীকে দেখতে পাবে আশাই করেনি। সব চেয়ে দুশ্চিন্তা ছিল পরীকে মুখ দেখাবে কী করে। সেই পরী বাড়িতে নিজেই হাজির।

বাবা তখন উঠোনে দাঁড়িয়ে আবার তার ইদানীংকার আপ্তবাক্যটি উচ্চারণ করলেন, বুঝলে কেহ আত্মাকে আশ্চর্যবৎ মনে করে—কেহ বা আশ্চর্যবৎ বলিয়া আত্মাকে বর্ণনা করে—আবার কেহ আশ্চর্য বলিয়া শোনে। কিন্তু ইহার বিষয় শুনেও কেহ ইহাকে বোঝে না।